মানবাধিকার বার্তা

thro.org.in

জুন, ২০২৬ দ্বিতীয় সংখ্যা

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন

সম্পাদকীয় :

এস.আই.আর. নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পুনর্বিবেচনা জরুরী বৃহত্তর বেঞ্চে

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা **এস.আই.আর. (S.I.R.)**-কে চ্যালেঞ্জ করে দাখিল করা মামলায় অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি রায় প্রদান করেছে। ১২৪ পাতার রায়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এস.আই.আর.-কে বৈধ ও সাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে এবং সুপ্রিমকোর্ট রায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন জরুরী। সংবিধানের ৩২৪ ধারা ও ৩২৭ ধারা মোতাবেক নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার রয়েছে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন করার। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছে, নির্বাচন কমিশনের নাগরিকতা যাচাই করার অধিকার রয়েছে। যদিও এই নাগরিকতা যাচাই সীমাবদ্ধ, শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য। সুপ্রিম কোর্টের আরো বক্তব্য, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নাগরিকত্ব যাচাই চূড়ান্ত নয় এবং এই যাচাইয়ের পরিণতি সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এই যাচাইয়ের ফলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাগরিকত্ব সম্পর্কে যদি নির্বাচন কমিশন নিঃসন্দেহ না হয়, তাহলে তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। কিন্তু এর ফলে বাদ পড়া ব্যক্তিটির নাগরিকত্ব সরাসরি খারিজ হয়ে যাবে না। নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের তালিকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই অনুত্তীর্ণদের আবারও পরীক্ষা নেবেন। তারপর পরীক্ষায় যদি তারা উত্তীর্ণ না হন, তখন তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ততদিনে অনুত্তীর্ণরা চূড়ান্তভাবে বেগনাগরিক হয়ে যাবেন। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে এও বলেছে, বিহারে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাচন কমিশন যে ১১ টি ডকুমেন্ট বা দলিল নির্ণয় করেছিল, তা আইন সঙ্গত এবং কোন কোন দলিল বা প্রমাণাদি ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হবে, তা নির্ধারণ করা নির্বাচন কমিশনার এখতিয়ার ভুক্ত। এ

নিয়ে প্রশ্ন করার কোন সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে আধার কার্ড-কে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মূলে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দলিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আরো বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চিহ্নিত ডকুমেন্ট বা দলিলগুলো নির্বাচন তালিকার শুদ্ধতা নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজনীয়। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে নির্বাচন কমিশন ব্ল্যাংক চেক পেয়ে গেল। বিহারের ক্ষেত্রে এই রায় কিন্তু প্রদান করা হয়েছে এস.আই.আর. হয়ে যাওয়ার পর এবং এস.আই.আর- এর ভিত্তিতে বিহারের বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর। বিহারে এস.আই.আর.- এর ফলে ভোটার তালিকায় ৭ কোটি ৪২ লক্ষ নাগরিক ছিল। বিহারের জনসংখ্যার সরকারি তথ্য অনুযায়ী বিহারে বৈধ ভোটার হওয়ার কথা ৮ কোটি ২২ লক্ষ।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অপ্রত্যাশিত ছিল না কারণ এস.আই.আর. নিয়ে মামলা শুনানির প্রথম থেকেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা যে সমস্ত মৌখিক পর্যবেক্ষণ দিচ্ছিলেন, তাতে স্পষ্ট ছিল যে এস.আই.আর. নিয়ে কোনরকম চ্যালেঞ্জই সুপ্রিম কোর্ট গ্রাহ্য করবে না। প্রতিবছরই ভোটার তালিকার খসড়া সংশোধন হয়। তারপরও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এস.আই.আর. কেন জরুরী, এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের রায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে সরকারি তথ্য দাখিল করা হয়েছিল, তাতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে বিহারের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ৩৭% নির্বাচন কমিশন চিহ্নিত ১১ টি দলিলের একটিও নেই এবং এই ১১ টি দলিলের একটিও না থাকার ফলে ভোটার তালিকা থেকে বিরাট সংখ্যক মানুষ বাদ পড়েছেন। বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য নাকি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এস.আই.আর. অপরিহার্য। কিন্তু এখন অব্দি নির্বাচন কমিশন সরকারিভাবে জানায় নি, বিহারে এস.আই.আর.-এর ফলে কতজন বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করা গেছে এবং সনাক্ত করা হয়েছে। বেসরকারি তথ্যে ভোটার তালিকায় বিদেশীদের সংখ্যা মেরে কেটে ১০-১২ জন হবে না বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে যারা বাদ পড়েছেন তাদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, পরিযায়ী শ্রমিক, প্রান্তিক অংশের মানুষ এবং নারীরা।

বিহারে প্রায় ৫০ লক্ষ ভোটারকে এস.আই.এর. মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা বৈধ ভোটার এই অনুমান কিন্তু আইনে আছে। কিন্তু এস.আই.আর.-এর মাধ্যমে এই অনুমানকে উল্টে দেওয়া হয়েছে। এখন ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের প্রত্যেককে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে তারা ভারতীয় অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিল এবং সুপ্রিম কোর্ট তাকে বৈধতা দিয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ ভোটারকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কি করে সুষ্ঠু ও অবাধ হতে পারে, এই প্রশ্নের কিন্তু উত্তর সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত রায়ে পাওয়া যায়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায় বাস্তব পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। যদিও বিহারের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা হয়েছিল আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে যে, হাজার হাজার ভোট বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেছে, জীবিত ভোটারদের মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ করাই হয়নি।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নির্বাচনে ৪৭ লক্ষ বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা নিয়েও কোন প্রশ্ন নেই, যদিও এটা বিহারের মামলা ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এস.আই.আর.-কে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলাগুলোর রায় বিহারের রায় অনুসারেই হবে, এ নিয়ে কোন দ্বিধা বা প্রশ্নের সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টের রায় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন সামনে নিয়ে এলো। এস.আই.আর.-এর মাধ্যমে সারা দেশে ১০ কোটি ভোটার ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং এদের ৮০% বৈধ ভোটার, বাকিরা মারা গেছেন কিংবা অনুপস্থিত এগুলো ধরে নিয়ে। তাদের নাম বাদ গেছে কারণ তারা ওই ১১ টি প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে পারেন নি। আবার পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করা সত্ত্বেও এবং নাগরিকত্বের অকাট্য প্রমাণ দেওয়ার পরেও "যৌক্তিক অসংগতি" অজুহাতে ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম সন্দেহভাজন/বিতর্কিত তালিকায় রাখা হয়েছে। তারা ভোট দিতে পারেননি এবং তাদের ভোট দেওয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে পরবর্তী বিচারিক প্রক্রিয়ার উপর।

ইতিমধ্যে ৪০০০ বিতর্কিত ভোটারদের আবেদন বিচারিক প্রক্রিয়ায় গ্রাহ্য হয়েছে, অর্থাৎ ৯০% আবেদনই গ্রাহ্য হয়েছে, এখন অব্দি যা তথ্য পাওয়া গেছে। তাহলে এত সংখ্যক ভোটারকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করাটা এখন স্বাভাবিক হয়ে গেল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অভূতপূর্ব। কোটি কোটি ভোটারদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করা হচ্ছে এবং দুঃখজনক হল, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোটি কোটি ভোটারদের বাদ পড়া নিয়ে কোন আলোচনা নেই, কোন প্রশ্ন নেই বা কোন উদ্বেগ নেই। তারপরও বলা হচ্ছে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য নাকি এস.আই.আর. গুরুত্বপূর্ণ।

এই রায়ের ফলে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভীতটাই দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রাপ্তবয়স্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার আজ প্রশ্নের মুখে। নির্বাচন কমিশন যদিও সাংবিধানিক সংস্থা কিন্তু জলের মত পরিষ্কার যে নির্বাচন কমিশন তার সক্রিয়তা ও সাংবিধানিক স্বাতন্ত্র হারিয়ে বসেছে। নির্বাচন কমিশন হয়ে পড়েছে শাসকদলেরই মুখপত্র। এটা বাস্তব সত্য এবং নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়ার ফলে আগামী দিনগুলোতে বিরাট সংখ্যক নাগরিকদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পছন্দ মত ভোটার তালিকা তৈরি করার রাস্তা হয়ে গেল। এতদিন অব্দি জনগণ সরকার নির্বাচন করতো, এখন উলট পুরান, সরকার জনগণকে নির্বাচিত করবে। সরকার কিংবা শাসক দল ঠিক করবে কাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে, কাদের নাম থাকবে না। নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নামে প্রতিদিন নাগরিকদের প্রতিদিন সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এস.আই.আর.-এর ফলে নাগরিকদের হেনস্তা, দুর্ভোগ, যন্ত্রণার কথা একবারও উল্লেখ করা হয়নি।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অদ্বিতীয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপ্রিমকোর্টের অনেক উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রায় আছে। অনেক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করেছে। সংবিধানের বিভিন্ন ধারার প্রগতিশীল ব্যাখ্যা দিয়েছে। যার ফলে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে সাধারণ নাগরিকদের অনেক প্রাপ্তি হয়েছে। কিন্তু এটাও ঘটনা যে বিভিন্ন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান রক্ষায়, নাগরিক অধিকার রক্ষায়, শাসকের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জরুরি অবস্থার সময় এ.ডি.এম. জবলপুর বনাম শিবকান্ত শুক্লা মামলার রায়। ঐ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চের চারজন বিচারপতির সংঘর্ষ রায়ে বলা হয়েছিল, জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের বাঁচার অধিকার নেই। মিসা সহ বিভিন্ন দানবীয় আইনে লক্ষ লক্ষ বন্দির আটকাদেশে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সর্বোচ্চ আদালতের নেই যেহেতু দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে মাত্র একজন বিচারপতি বলেছিলেন যে, জরুরি অবস্থার সময়ও বাঁচার অধিকার বহাল থাকে কারণ বাঁচার অধিকার নাগরিকদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সংবিধান মুলতবি থাকলেও নাগরিকদের বাঁচার অধিকার হরণ করা যায় না। জন্মসিদ্ধ বাঁচার অধিকারকে সংবিধান শুধুমাত্র স্বীকৃতি দিয়েছে। ওই বিচারপতির নাম এইচ. আর. খান্না। এই বিরুদ্ধ রায় দেওয়ার খেসারত বিচারপতি এইচ. আর. খান্নাকে দিতে হয়েছিল। সিনিওরিটির ভিত্তিতে তাঁর পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিরুদ্ধ রায় দেওয়ার জন্য তাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদী বিচারপতি এইচ. আর. খান্না পদত্যাগ করেছিলেন।

২০১২ সনে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, এ.ডি.এম. জবলপুর বনাম শিবকান্ত শুক্লা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় ছিল মানবাধিকার বিরোধী। গত এক দশকে সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রেই দৃঢ় অবস্থান নিতে পারছে না। সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের অভিমত, যখন কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার থাকে তখন অনেক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে না। বিহারের এস.আই.আর-কে বৈধতা দিয়ে প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল এবং কোটি কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার হরণ আইনি স্বীকৃতি পেয়ে গেল। তাই সুপ্রিম কোর্টের দুজন বিচারপতির এই রায় বৃহত্তর বেঞ্চে অচিরেই পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সূচিপত্র

১. আরশোলারা এখন সংবাদ শিরোনামে - পুরুষোত্তম রায় বর্মন

২. কিউবা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাত উঠাও - বিবেক রায়

৩. তিহার ডায়েরি: জাতপাত, আটক এবং প্রতিবাদ দমন- নিতীশ

৪. ছুতমার্গ - কাজী নজরুল ইসলাম

৫. স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা -কাজী নজরুল ইসলাম

৬. সঞ্চিতা: বাজেয়াপ্তের বিজ্ঞপ্তি লেখা হয়েও সই হয়নি - শিশির কর

৭. বিদ্রোহীকে নিষিদ্ধ করার সাহস হয়নি ব্রিটিশদের

৮. কাজী নজরুল : সকল দেশের, সকল মানুষের।

৯.একটি অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত - অলকানন্দা চৌধুরী

১০. মানবাধিকার : প্রতিবাদে ও উদযাপনে টি এইচ আর ও - মনিময় রায়

১১. বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা - মিহির লাল রায়।

আরশোলারা এখন সংবাদ শিরোনামে

- পুরুষোত্তম রায় বর্মন

আরশোলা এখন সংবাদ শিরোনামে। ইংরেজিতে বললে Crochroaces are in the news headlines. ইনস্টাগ্রামে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্যাগলাইন we are Crochroaces. অর্থাৎ আমরা সবাই আরশোলা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যাবে না। বেনজির। অভূতপূর্ব। একটি সামান্য পোকা জাতীয় প্রাণীর এভাবে সংবাদ শিরোনামে চলে আসা বিশাল প্রাপ্তি। শুধুমাত্র আরশোলাদের জন্য নয় এই গ্রহের তাবৎ জীবকুলের জন্যও বটে। আরশোলাদের ইতিহাস ত্রিশ কোটি বছরের। এটা ঘটনা। কিন্তু এই কলমচি এই ঘটনা সম্পর্কে জানলো অতি সম্প্রতি। ডাইনোসরের আগেও আরশোলা ছিল। ৩০ কোটি বছরে অনেক প্রাণী হারিয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু আরশোলারা টিকে আছে। সাম্প্রতিক প্রচার ও সংবাদ শিরোনামে চলে আসার দৌলতে আরশোলারা যা দম পেয়ে গেল তাতে বোধ হয় তাদের আরো দশ কোটি বছর আয়ু নিশ্চিত হয়ে গেল। আরশোলাদের তুলনায় মানুষ তো কিছুই না। আধুনিক মানুষদের বয়স বড় জোর মেরে কেটে দু লক্ষ বছর। ২ লক্ষ বছরের মানুষ নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবের পর্যায়ে নিয়ে গেছে শ্রমে ও মেধায়, সৃষ্টিতে ও ধ্বংসে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি একটি মামলার শুনানি কালে বলেছেন, যুবকরা কোন কাজ না করে কখনো হয়ে যায় সাংবাদিক, কখনো তথ্য অধিকার যোদ্ধা, কখনো পরিবেশবিদ, কখনো social activist বা সামাজিক সক্রিয়তাবাদী। তারা সবাই বিপদজনক। তারা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাইছে। তারা সবাই আরশোলা। প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল উঠে, সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। তারপর প্রধান বিচারপতি স্পষ্টিকরণ দেন, যুবকদের অপমানিত করার কোন অভিপ্রায় তার ছিল না। তিনি যুবকদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। নকল এলএলবি ডিগ্রী নিয়ে যে সমস্ত আইনজীবী আদালতে প্র্যাকটিস করছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলেছেন। প্রধান বিচারপতির স্পষ্টিকরণে কিন্তু আরশোলা পরিস্থিতি শান্ত হয়নি।

মানুষকে আরশোলা বলা, তার বিরুদ্ধে যতই অভিযোগ থাকুক না কেন চূড়ান্ত অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়। মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষেরই ন্যূনতম সর্বজন গ্রাহ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি রয়েছে। মানুষকে আরশোলা বলা, পোকা বলা, ঘুষপেটিয়া বলে একটা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা এগুলো বিকৃত ও অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়। ফ্যাসিস্টরা সমাজে ঘৃণা ও হিংসাকে অতি স্বাভাবিক দৈনন্দিন বিষয়ে পরিণত করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষকে পোকামাকড়, পতঙ্গ ইত্যাদি বিশেষনে অভিহিত করে তাদেরকে ইতর প্রাণীর পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং তাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের হিংসা এবং বৈষম্য স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ এক শ্রেণীর সহ নাগরিককে মানুষ হিসেবে দেখেনা, তাদেরকে ইতর প্রাণী বলে মনে করে। ঐরকম পরিস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে হিংসাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাদেরকে "অমানবিক অপর" হিসেবে দেখা হয় এবং তাদের প্রতি যেকোন বৈষম্য বা অন্যায় সহ নাগরিকদের চোখে অস্বাভাবিক ঠেকে না। কারণ ততদিনে সহ নাগরিকদের চোখে তারা আর সহ নাগরিক নন, মানব প্রজাতির অংশ নন, তারা সব ইতর

প্রাণী। দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজে একাংশের মধ্যে ১০০ বছরের প্রচেষ্টা এবং বিশেষত বিগত ১২-১৩ বছরের শাসনের দৌলতে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার বিষ মননের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে। তাই সহ নাগরিকদের আরশোলা বলতে দ্বিধা থাকে না।

স্মৃতি সততই দুর্বল। তবুও মনে রাখতে হয় । ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮, গঙ্গাপুর, রাজস্থান। নির্বাচনী সভা। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বক্তৃতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসামের খসড়া নাগরিকপঞ্জির উল্লেখ করে বলেন, অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা 'পোকা '। তারা দেশে ঢুকে পড়ছে।
অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরাও মানুষ। তাদেরকে 'পোকা' বলে সম্বোধিত করা কিন্তু মনুষ্যত্বের অপমান।

২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০১৮। স্থান, রাম লীলা ময়দান। নয়াদিল্লি । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ময়দানের জনসভায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আবারও পোকা বলে উল্লেখ করেন। ১১ই এপ্রিল, ২০১৯ , স্থান রায়গঞ্জ, পশ্চিম বাংলা। লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে জনসভায় আবারো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথাকথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের 'পোকা' বলেই সম্মোধিত করেন । সিলসিলা জারি হ্যাঁয়। এরপরেও বহু সভায় ও প্রকাশ্য জনপরিসরে শাসক দলের রাঘব বোয়াল থেকে শুরু করে সিকি আধলী নেতারা অব্দি দেশের নাগরিকদের একাংশ সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিজনক , কুরুচিপূর্ণ ও ঘৃণা সূচক মন্তব্য করেছেন। ফ্যাসিস্টদের এটাই কায়দা।

আমাদের দেশের যুবশক্তি আমাদের সম্পদ। প্রত্যেক দেশেই যুবশক্তি সম্পদ। মাও সেতুং বহু পূর্বেই বলেছিলেন, যুবকরা সকাল আটটা নয়টার সূর্য। যুবকরাই ভবিষ্যৎ। যুবকরা আগুনে ঝাঁপ দিতে জানে। যুবকরা মরনকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে পারে। তারা আদর্শের জন্য মৃত্যুকে চুমু দিতে জানে। বর্তমান ভারতবর্ষকে বলা হচ্ছে যৌবনের দেশ। আমাদের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ যুবক। এটা আমাদের দেশের পক্ষে আশীর্বাদ। দেশ গঠনে ও জাতি গঠনে

জনসংখ্যা বিন্যাস জনিত এই সুবিধাকে যদি কাজে লাগানো যায়, যদি যুবশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে দেশ। যুবকরা কাজ চায়। যুবকরা অলস নয়। আমাদের দেশের কোটি কোটি যুবক কর্মহীন। শিক্ষিত যুবকরা কর্মহীন। অর্ধশিক্ষিত যুবকরা কর্মহীন। অশিক্ষিত যুবকরা কর্মহীন। সব ধরনের কাজেরই বড় আকাল। এমন নয় যে যুবকদের সামনে থরে থরে কাজ সাজানো আছে। যুবকদের ডাকছে, তোমরা আসো, কাজ বুঝে নাও। তোমাদের অপেক্ষায় কারখানার অ্যাসেমলি লাইন ফাঁকা থাকা পড়ে আছে। সরকারি ও বেসরকারি অফিসের চেয়ারগুলো ফাঁকা। সার্ভিস সেন্টারে কোটি কোটি কাজ। তোমরা আসো। তোমাদের জন্য সার্ভিস সেক্টর মুখ থুবড়ে আছে।

তাহলে কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসে বলতেই পারেন, যুবকরা অলস, তারা কাজ করতে চায় না, তারা কর্মে নিযুক্ত না হয়ে তথ্যের অধিকার নিয়ে লাফালাফি করে। তারা পরিবেশের নাম করে উন্নয়নে বাধা দেয়। তারা সক্রিয়তাবাদী হয়ে ইনকিলাব স্লোগান দেয়। তারা আজাদীর কথা বলে। তারা স্বপ্ন বিলাসী। তারা অকর্মণ্য। তারা অলস। তারা পরজীবী।

বেকারির হার ৫.২ শতাংশ। যুবকদের মধ্যে বেকারির হার ১৬ - ১৭ শতাংশ। ৬৪.৩ কোটি শ্রমশক্তি সম্পন্ন দেশে মাত্র ৬০ ভাগ কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত। বাকি চল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ কোটি বেকার। অর্থাৎ ২৫ কোটি আরশোলা রয়েছে সরকারি হিসেবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী দেশে ২৬০,০৬১ টি রেজিস্টার্ড কারখানা। এই কারখানাগুলোকে নিযুক্তদের সংখ্যা দু কোটির বেশি নয়। এআইর দোলতে কারখানাগুলোর অনেক কাজ এআই কেড়ে নেবে।

কদিন আগের খবর, সর্বভারতীয় অনেক কাগজেই বিষয়টি খবর হয়েছিল। উড়িষ্যায় হাজার পাঁচেক হোমগার্ড পদের জন্য দরখাস্ত করেছিল কয়েক লক্ষ যুবক। দরখাস্তকারী যুবকদের মধ্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও

পিএইচডি ডিগ্রিধারীরাও ছিলেন। কয়েক লক্ষ আবেদনকারীর লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য স্টেডিয়াম ভাড়া করতে হয়েছে। হোম গার্ডের চাকরির জন্য লক্ষ লক্ষ যুবকরা আবেদন করেন। উচ্চশিক্ষিত যুবকরাও আবেদন করতে বাধ্য হন। যে চাকরিতে নির্দিষ্ট বেতন ক্রম নেই। বেতন-ক্রম ছাড়া প্রায় স্থির বেতন। দেশজুড়ে ভয়াবহ বেকার সমস্যা। গ্রামে কাজ নেই। রাজ্যে কাজ নেই। তাই এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে কাজের জন্য শ্রমিকরা পাড়ি দেন। তারা পরিযায়ী শ্রমিক। বিভিন্ন শহরগুলোতে আবাসন শিল্পে ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে তারা কাজ করেন নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে। তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। নূন্যতম মজুরিও তাদের মেলে না। ৮ ঘন্টা কাজের বিলাসিতা কবেই হারিয়ে গেছে। নয়া উদারবাদের কৃষ্ণ গব্বরে, বর্বর পুঁজিবাদের মুনাফার গনগনে আগুনে। ১২ ঘন্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ৬ ফুট / ১২ ফুট ঘরে সাত আট জনকে থাকতে হয়। তবুও তারা কাজ করেন নিজেদের জন্য, পরিবারের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। নূন্যতম মজুরি চাইলে তাদেরকে দেশদ্রোহী বলা হয়। রাজধানী দিল্লির অদূরেই নয়ডা সহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই যুবক, অমানুষিক শ্রম শোষণের শিকার। বহুজাতিক পুঁজি ও দেশীয় পুঁজির বুলডোজারে শ্রমিকদের অধিকার চূর্ণ, বিচূর্ণ। কার পাপে কার দোষে ভারতবর্ষের যৌবন বেকার । হাতে কাজ নেই। কাজের সন্ধানে যুবক যুবতীরা হন্য হয়ে ঘুরে। সরকারি নিয়োগ বন্ধ। স্থায়ী নিয়োগ নেই । চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। হায়ার এন্ড ফায়ার। এদেশের যুবকরা কাজের জন্য বিদেশি সৈন্য বাহিনীতে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে থাকে। বিদেশের মাটিতে বেঘোরে মারা যায়। যারা যুবকদের অলস বলে, যারা বলে যুবকরা কোন পেশায় স্থান না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝুকে পড়ে তারা কি জবাব দেবে না। এই বেকার সমস্যার জন্য কি যুবকরা দায়ী নাকি আমাদের দেশের শাসকরা দায়ী, ব্যবস্থা দায়ী। একচেটিয়া পুঁজিবান্ধব সরকার দায়ী। যাদের চোখ কান খোলা আছে, যাদের চিন্তা করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আছে তারা এই

অবস্থার জন্য দায়ী করবে ব্যবস্থাকে, সরকারের নীতিকে, উন্নয়নের সর্বনাশা পথকে । কর্পোরেটদের স্বার্থে দেশকে পরিচালিত করার জন্য খেসারত দিচ্ছে আমাদের যুবকরা। যুবকরা পরজীবী নয়। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ পরজীবী নয়। তাদের শ্রমে মেধায় আমাদের সম্পদ তৈরি হয়। আমাদের জাতীয় উৎপাদনে শ্রমজীবী মানুষদের অবদান পাহাড় প্রমাণ। শোষকরা পরজীবী, ভূ স্বামীরা পরজীবী, কর্পোরেটরা পরজীবী, উচ্চবিত্তরা পরজীবী। সভ্যতার ইতিহাসে যুগে যুগে একদল মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শ্রম আত্মসাৎ করে ফুলে ফেঁপে কলা গাছ হয়েছে।

মিডিয়াতে যুবকদের উপস্থিতি নিয়ে এত জ্বালা কেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে যুবকরা যাচ্ছে । এতে এত রাগ কেন। বৃহৎ মিডিয়া কর্পোরেটদের দখলে। বৃহৎ মিডিয়া মালিকের কথা বলে, শাসকের কথা বলে। শাসকদের নির্মিত মহাআখ্যান ফেরি করে। কৃত্রিমভাবে গণ সম্মতি তৈরি করে। চমস্কি বলেছিলেন, ম্যানুফ্যাকচার্ড কন্সেন্ট। কৃত্রিমভাবে নির্মিত গনসম্মতিতে পুঁজিপতিদের উন্নয়নই জাতীয় উন্নয়ন। পরিবেশ ধ্বংস করে উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন। জাতীয় স্বার্থে জরুরী। সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদী আখ্যানই জাতীয়তাবাদ। নেতার বাণী জাতীয় বাণী। সামাজিক মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের জন্য হরেক রকম ফিকির আটছেন। আইন সংশোধন করার চেষ্টা করছেন। তথ্যের অধিকার আইন বহু সংগ্রামের পরে অর্জিত হয়েছিল। বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকারের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারের অন্তর্গত তথ্যের অধিকার। প্রায় দু দশক পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, তথ্যের অধিকার মৌলিক অধিকার। এই পর্যবেক্ষণের অনেক পরে তথ্যের অধিকার আইন হয়েছে। যদিও এখন তথ্যের অধিকার আইনের বারোটা বেজে গেছে। সংশোধনী এনে আইনকে নখদন্তহীন করা হয়েছে। তারপরেও তথ্যের অধিকার আইন নিয়ে এত জ্বালা কেন। কোন যুবক যদি

বাড়ির খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় তাহলে গুমোর ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে যায়।

তাই যুবকদের উপর এত রাগ। কোন যুবক যদি তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগ করে গ্রামের পঞ্চায়েতের বার্ষিক বরাদ্দ কত জানার উদ্যোগী হয় তাহলে এত আপত্তি কেন। আপত্তি হচ্ছে কেননা দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাবে। সত্য বেরিয়ে আসবে।

পরিবেশের জন্য যারা লড়াই করে তারা তো বসুন্ধরাকে বাঁচানোর জন্য লড়ছে। লোভ সর্বস্ব পুঁজিবাদের আগ্রাসি ক্ষুধা থেকে এই সবুজ গ্রহকে বাঁচানোর লড়াই যদি কোন যুবক কাঁধে তুলে নেয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তবে তাকে তো অভিনন্দিত করা উচিত। উন্নয়নের নামে পরিবেশের ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। অবাক কান্ড সর্বোচ্চ আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের বয়ান মেনে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পকে সবুজ ঝান্ডা দেখাচ্ছে। যদিও এর ফলে সর্বনাশ হচ্ছে দেশের, প্রকৃতির, জলবায়ুর। বনজ সম্পদ লুঠ হচ্ছে, ভয়াবহ আদিম লুঠ, আদিম হিংস্রতা। বিলুপ্তির মুখোমুখি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা । জীববৈচিত্র । থর মরুভূমি ধেয়ে আসছে গিলে খেতে। আরাবল্লী পর্বতমালাকে যখন ধ্বংসের লাইসেন্স যখন পেয়ে যায় সরকার এবং রিয়েল এস্টেট সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দৌলতে তখন হাজার হাজার যুবক যুবতীরাই রাস্তায় নেমে এসেছিল। কোন লোভে নয়, কোন প্রাপ্তির আশায় নয়, দেশকে বাঁচাতে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাদেরকে যখন আক্রমণ করা হয়, পরিবেশ সৈনিকদের নিয়ে যখন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয় তখন বুঝতে বাকি থাকে না ডালমে কুছ কালা হে।

আরশোলা নাকি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। আরশোলা আবার আবর্জনাও ধ্বংস করে। বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে আরশোলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ সংগ্রাম করছে এক মানবিক বিশ্বের জন্য। অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই যুগে যুগে মানুষ গড়ে তুলেছে উন্নত ব্যবস্থা। প্রচলিত ব্যবস্থা যখন পচে যায় , বিকারগ্রস্ত হয়ে

পড়ে প্রগতির পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় । তখন প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থার উদয় অনিবার্য। ইতিহাস এর অমোঘ সাক্ষী। সংবিধানে আমরা সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায় অর্জনের সংকল্প ঘোষণা করেছি। সেই ন্যায় থেকে এখনো আমরা দূরে। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরনের কথা বলা হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সমতা ছাড়া অর্থহীন। বৈষম্য ও অসাম্যের প্রশ্নে ভারত আজ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ । তীব্র বেকারি ও চরম অসাম্য পীড়িত বর্তমান ব্যবস্থা সবার জন্য সামাজিক , অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক ন্যায় অর্জনের পথে চরম অন্তরায়। যে ব্যবস্থা কোটি কোটি বেকারকে কর্মহীন রাখে, যে ব্যবস্থায় এক শতাংশ মানুষের হাতে জাতীয় সম্পদের ৫০ ভাগ কুক্ষিগত হয় , যে ব্যবস্থায় সবার জন্য শিক্ষা সবার জন্য স্বাস্থ্য অর্জন অসম্ভব , যে ব্যবস্থায় অর্ধেক আকাশ নারীরা প্রতিনিয়ত হিংসার শিকার হয় , যে ব্যবস্থায় স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচনের নামে কোটি কোটি নাগরিককে ভোটাধিকারহীন বেনাগরিকে পরিণত করা হয় , যে ব্যবস্থায় আদিবাসীও দলিতরা অধিকার ও মর্যাদা থেকে শত যোজন দূরে থাকে , যে ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা নিরাপদে রাত্রিতে ঘুমাতে পারেনা , শিশুরা শৈশবে বার্ধক্যে উপনীত হয় , যুবকদের মুখে হাসি থাকে না , যৌবন হারিয়ে যায় হতাশার কালো অন্ধকারে , যে ব্যবস্থায় ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের আফিম ফেরি করে , সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন চরম নৈতিক কর্তব্য আপামর দেশবাসীর। প্রত্যেক ব্যবস্থারই কিছু মধু ভক্ষণকারী থাকে , যারা পরজীবী , পরভোজী , যারা অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে বেঁচে বর্তে থাকে , যারা ছড়ি ঘোরায়, যাদের মুখে হাসি দাঁতে বিষ। যারা ন্যায়ের ধজ্জ্যা ধারণ করে অন্যায় করে যায় । তারাই যুবকদের বিরুদ্ধে কামান দাগায়। তারাই আসল রোগকে আড়াল করার চেষ্টা করে। রোগের লক্ষণ নিয়ে তারা বেশি কথা বলে , রোগের গোড়ায় যেতে তাদের ভয়। গোড়ায় গেলে তো সবকিছু বেরিয়ে আসবে সামনে।

তারাই আবার নিট নিয়ে কথা বলে না। ২৩ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন জুয়ারিরা জুয়া খেলে তখন তারা নির্বাক। যখন ন্যায্যমজুরি চাওয়ার অপরাধে শ্রমিকদের সন্ত্রাসবাদী বলে তকমা দেওয়া হয় তখন তারা ধ্যানমগ্ন থাকে , তারা ভাবের ঘরে চুরি করে। তাই তারা আরশোলা বলে যুবকদের, পরজীবী বলে শ্রমজীবীদের। তারা দর্পণে নিজেদের চেহারা দেখে সবাইকে নিজেদের রঙে রাঙিয়ে দিতে চায়। তাই আরশোলা তাদের কাছে বিপদজনক। ফ্যাসিস্টদের ভাষায় তারা কথা বলে।

ফ্যাসিস্টরা জার্মানিতে ধারাবাহিকভাবে ইহুদীদের মানবিক সত্তা অস্বীকার করে তাদের অভিহিত করেছে পরজীবী বলে। ক্ষমতায় আসার এক দশক পূর্বেই ১৯২০ সনে অ্যাডলফ হিটলার প্রকাশ্যে ইহুদীদের ক্ষতিকর জীবাণু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। হিটলার বলেছিলেন, একজন ডাক্তার যেভাবে রোগীকে বাঁচানোর জন্য অসুখ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে তেমনি জার্মানিকেও বাঁচার জন্য ইহুদীদের 'অপসারণ' করতে হবে। ইহুদিদের বিরুদ্ধে হলোকাষ্টের জন্য প্রস্তুতি কিন্তু ১৯২০ দশকের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। ইহুদিরা মানুষ নয় ঊন মানব। জার্মানদের মনে ইহুদি বিদ্বেষকে গাড় করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বক্তৃতায়, রাষ্ট্রীয় আইনের বয়ানে , সংবাদপত্রে, বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ইহুদিদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হতো। ইহুদিদের ইদুর বা আরশোলা বলে গালিগালাজ করা হতো। নাজি জার্মানিতে সরকারি উদ্যোগে কুখ্যাত চলচ্চিত্র 'ইটারনাল জিউ' ১৯৪০ সনে তৈরি হয়। ওই চলচ্চিত্রে ইহুদিদের এক ঝাঁক ইঁদুর বা আরশোলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং দুর্নীতির জন্য ইহুদিদেরকে দায়ী করা হয়েছে। ইহুদিদের সম্বোধন করার সময় সব সময় এক বচন ব্যবহার করা হতো। এটা করা হয়েছিল সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যে। একজন ইহুদির কোন একক ব্যক্তি সত্তা নেই। ইহুদিরা সামূহিকভাবে একক সত্তা। সামূহিক সত্তা এবং এই সত্তাটাই চূড়ান্তভাবে বিপদজনক। হিটলার বারবার বলতেন, ইহুদিরা "সাংস্কৃতিক

পরজীবী"। সমাজ জীবনে তাদের কোন অবদান নেই। তাঁরা যে দেশে আছে 'অতিথি' দেশ থেকে সব নিংড়ে নেয়। ইহুদিদের প্লেগ এর জীবানুও বলা হত। ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপমানজনক সম্বোধন ব্যবহার করা, তাদেরকে জীবাণু হিসেবে চিহ্নিত করা, মূল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের ইতর প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা। মানবিক সত্তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা। তাদেরকে জীবাণুগত বিপদ হিসেবে দেখানো। এবং এই জীবাণুকে ধ্বংস না করে জার্মানরা বাঁচবে না এটা প্রতিষ্ঠিত করা। ফ্যাসিস্টরা জার্মানির সর্বত্র একটি স্লোগান দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল jews are our misfortune. কোন এলাকা থেকে ইহুদিদের উচ্ছেদ করে পোস্টার সেটে দেওয়া হতো। cleansed of jews বা ইহুদী মুক্ত এলাকা।

সামাজিক মননে যখন একটি জনগোষ্ঠীকে 'অপর' হিসেবে হাজির করে তাকে ইতর প্রাণী বা ভয়ংকর কীটনাশক জীবাণু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন ঐ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বিচার হিংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং ওই নির্বিচার হিংসার বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিরোধ গড়ে উঠার পথে অন্তরায় তৈরি হয়, কেননা ততদিনে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীটি সামাজিক মননে মনুষ্যত্বের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি তার বক্তব্যের স্পষ্টীকরন দিয়েছেন। তারপরও কেন ডিজিটাল দুনিয়ায় এত বিক্ষোভ। প্রতিবাদের সুনামী। অবরুদ্ধ আবেগ, যন্ত্রণা, ব্যথা, ক্ষোভ, জ্বালা, আশা ভঙ্গের কান্না, স্বপ্ন গুলির বাস্তবের কর্কশতায় কণ্টকবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত হওয়া, অপমান হওয়ার অনুশোচনা ইত্যাদি প্রকাশের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

আপামর দেশবাসীকে শাসকদের প্রতিনিয়ত অপমান করা, সাধারণ নাগরিকদের ঊন মানবে অধঃপতিত করার ফ্যাসিবাদী বুলডোজারের বিরুদ্ধে ডিজিটাল দুনিয়ায় সুনামী। এই সুনামী নেমে আসবে ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে ধুলাবালি প্রান্তরে।

কিউবা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাত উঠাও

- **বিবেক রায়**

কিউবার বিরুদ্ধে চরম আগ্রাসনে নেমেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিউবার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক অবরোধকে সাম্প্রতিককালে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬২ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেছে। ইদানিংকালে কিউবাতে জ্বালানি সংকট তীব্র করে অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে ও কিউবানদের চরম শোচনীয় দূর্দশায় ফেলতে মার্কিন নৌবহর কিউবাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কিউবাতে জ্বালানি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে কোন তৈলবাহী জাহাজ কিউবার বন্দরে ভিড়তে পারছে না । কিউবার জ্বালানি চাহিদার সামান্য যোগান আসে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে। চাহিদার সিংহভাগই রপ্তানি থেকে মেটাতে হয়। এই বছর জানুয়ারি মাসে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করার পূর্বে কিউবাকে জ্বালানি যোগাত ভেনেজুয়েলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে অপহরণ করে আটক করার পর ভেনেজুয়েলার তৈল কূপগুলোর দখল কার্যত নিয়ে নিয়েছে। ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবায় পেট্রোল যায় না। মেক্সিকো থেকেও কিউবাতে জ্বালানি যাওয়ার সুযোগ নেই। মার্কিন নৌবহরের অবরোধ। ফলে কিউবার

অর্থনীতি ও জনজীবন এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে। যদিও মার্কিন অবরোধ অগ্রাহ্য করে রাশিয়া কিউবাতে জ্বালানি পাঠিয়েছে। চীন খাদ্য শস্য পাঠিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিউবা দখলের সরাসরি হুমকি দিয়েছেন। কিউবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ত্রো রুজের বিরুদ্ধে একটি মার্কিনি আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। চূড়ান্তভাবে এক্তিয়ার বহির্ভূত, বেআইনি ও অবৈধ গ্রেফতারি পরোয়ানা। সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন কানুন লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৪ বছর বয়সী রাহুল কাস্ত্রো রুজের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে ১৯৯৬ সনে ফ্লোরিডা উপকূলে দুটি অসামরিক বিমানকে গুলি করে নামানোর অভিযোগে। এই ঘটনায় চারজন মারা যায়। এ দুটি বিমান মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর মদতে কিউবার আকাশ সীমানায় প্রবেশ করে গোয়েন্দাগিরি করছিল। ব্রাদার্স অফ রেসকিউ প্রতিষ্ঠাতা যোজ বাসালকো। এই ব্যক্তিটি ১৯৬১ সনে মার্কিনী মদতে কিউবার অভ্যন্তরে সশস্ত্র হামলা সংগঠিত করেছিল বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করার জন্য। বে অফ পিগ আগ্রাসন ব্যর্থ হয়েছিল। সেই আগ্রাসনের খলনায়ক ছিলেন যোজ বাসালকো ও সিআইএ। বাসালকো সিআইএ দ্বারা প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদ। বাসালকোদের সংগঠন ব্রাদার্স টু দা রেসকিউ মার্কিন সেনাবাহিনীর মদতে কিউবার আকাশ সীমায় ঢুকে অসামরিক বিমান নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করছিল। কিউবার সেনাবাহিনী এই দুই বিমান চালককে বারবার সতর্ক করছিল এবং কিউবার আকাশ সীমানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু বিমান চালকরা কিউবার আকাশ সীমা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল স্পষ্ট সতর্কতা বাণী অগ্রাহ্য করে। তখন ওই দুটি বিমানকে গুলি করে নামানো হয়। চারজন বিমান চালক মারা যান। ওই সময় রাহুল কাস্ত্রো কিউবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। এই ঘটনার অজুহাতে রাহুল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে মার্কিন আদালত।

কিউবা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। ১৯৫৯ সনে বিপ্লবের পর কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবরোধ উপেক্ষা করে, মার্কিন আগ্রাসন অগ্রাহ্য করে, দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এবং সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জনজীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষু শূল কিউবা। আন্তর্জাতিক সৌভাতৃত্বের ক্ষেত্রে দারুণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কিউবা গত ৬৫ বছরে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিউবা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। কিউবান চিকিৎসকেরা বিভিন্ন দেশে দুঃস্থ ও আর্তদের চিকিৎসা ও নিরাময়ে নিরলস ভাবে নিয়োজিত। কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক অবরোধ অবৈধ। এই মর্মে রাষ্ট্রসংঘ গত ৬৫ বছরে কয়েকশো প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সমস্ত প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে মার্কিনী অবরোধ জারি আছে। এই নিষ্ঠুর অবরোধ সত্ত্বেও কিউবার সাফল্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। রাহুল কাস্ত্রো রুজের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চূড়ান্তভাবে অবৈধ। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া উচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবাতে সামরিক আগ্রাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিউবানরা সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হয় সমাজতন্ত্র নয় মৃত্যু। হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু। এই স্লোগানে উদ্দীপ্ত। কিউবা একা নয়। কিউবার পাশে রয়েছে সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ , প্রতিবাদী মানুষ। কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিনী অপরাধ ও নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার বিরোধী। এটা জেনোসাইড। একটা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য , তার স্বাধীন স্বকীয় অস্তিত্বকে ধ্বংস করার জন্য , তাকে ভাতে মারার চেষ্টা জেনোসাইড ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কিউবা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হাত উঠাতে হবে।

তিহার ডায়েরি: জাতপাত, আটক এবং প্রতিবাদ দমন

- নিতীশ

২০২৫ সালের ২০ আগস্ট, আমি ফোন কল ও বার্তা পেতে শুরু করি — বি. আর. আম্বেদকর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গেটে কোনো একটি যন্ত্র বসানো হচ্ছে । সেসময় আমি জে.এন.ইউ ছাত্র সংসদের সভাপতি ছিলাম । আমি গেটে পৌঁছে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ রাখতে বলি , যতক্ষণনা ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে কথা বলা যায় । সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না। প্রতিবাদের পর কাজ সেদিনের মতো বন্ধ হয় ।

এরপর আমরা ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কাছে কিছু প্রশ্ন পাঠাই ফেসরিকগনিশন টেকনোলজি সিস্টেম সম্পর্কে — তখনও আমরা জানতাম না এটিএফ.আর.টি । আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, এসি / ইসি বৈঠকের

কার্যবিবরণী, যন্ত্রের খরচ এবং এর পেছনের যুক্তি জানতে চাইলাম । কিন্তু সংলাপের পথে না গিয়ে তিনি ক্যাম্পাসে দিল্লি পুলিশ মোতায়েন করে জোর করে সিস্টেমটি বসিয়ে দিলেন।

একটি প্রতিবাদ এবং অনির্দিষ্ট কালীন ধর্নার ঘোষণার পর, জেএনইউ প্রশাসন রেজিস্ট্রারের সই দেওয়া একটি নোটিশ জারি করে বলল, তারা সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্য একটি কমিটি গঠন করবে এবং যন্ত্র বসানোর বিষয়ে যতক্ষণ না সমাধান হয় ততক্ষণ স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে । কিন্তু প্রশাসন এই আশ্বাস ভঙ্গ করল এবং কমিটি গঠন না করেই জেএনইউএসইউ নির্বাচনের সময় — যখন আদর্শ আচরণবিধি চালুছিল — আবার সেটি বসানোর চেষ্টা করল।

নতুন ইউনিয়ন অদিতিকে সভাপতি করে এলে তারাও প্রতিবাদ করল। এফআরটি খুলে নেওয়া হলো, এবং প্রশাসন সব চার পদাধিকারীকে, আমাকে সহ, বহিষ্কার করল। কিন্তু এই বহিষ্কার এলো ইউনিয়ন যেদিন রোহিত আইনের দাবিতে ৩ফেব্রুয়ারি মিছিলের ঘোষণা দিয়েছিল, তার একদিন আগে।

ক্যাম্পাসে আন্দোলন ৩ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বহিষ্কারের বিরুদ্ধে, সিপিও ম্যানুয়ালের বিরুদ্ধে, এবং রোহিত আইন চালুর দাবিতে। একাধিক ধর্মঘট, ধর্না, মিছিল, জুলুস হলো কিন্তু প্রশাসন চুপ রইল। তবে ম্যাডাম ভিসিশান্তিশ্রীডি. পণ্ডিত একটি পডকাস্টে লজ্জাজনকভাবে বললেন, দলিতরা কৃষ্ণাঙ্গদের মতোই চিরস্থায়ী শিকারে পরিণত । এটা অসহ্য ছিল। তিনি সংগ্রামের বহু বছরকে, আমাদের মর্যাদার লড়াইকে, অপমান করলেন।

একাধিক প্রতিবাদও মিছিলের পরেও তিনি ক্ষমা চাইলেননা, পদত্যাগ ও করলেন না। তখন জেএনইউএসইউ তাঁর পদত্যাগের দাবিতে এবং রোহিত আইন সহ ইউজিসি বিধিমালা কার্যকর করার দাবিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা দিল । কিন্তু সবরমতী টি-পয়েন্ট থেকে শান্তিপূর্ণ ভাবে যে মিছিল শুরু হয়েছিল, তাতে নেমে এলো সহিংসতা । দিল্লি পুলিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরগেট আটকে ব্যারিকেড তৈরি করল । আরএএফ, কাঁদানে গ্যাস, রাইফেল এবং দাঙ্গা-নিয়ন্ত্রণ যান নিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হলো । এক পুলিশ অফিসারের কাছে জানা গেল, সেদিন বারোটি থানা থেকে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

এত ভারী বল প্রয়োগ কেন? সহজ উত্তর — আমরা বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যের কাছে জবাব দিহি চাইছিলাম। দিল্লি পুলিশ আমাদের বন্ধুদের মেরেছে। পুলিশ ছাত্রসভাপতি অদিতি, যুগ্মসম্পাদক ডানিশ, সহ-সভাপতি গোপিকা এবং ডজন ডজন ছাত্রকে টেনেহিঁচড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটথেকে ক্যাম্পাসে পাঠাল। একপুলিশ, যাকে ভিডিওতে সর্বত্র দেখা যাচ্ছিল, বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতিকৃতি ধরে থাকা একব্যক্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটি কেড়ে নিয়ে ভেঙেদিল। ভারত সরকার পরে সব সোশ্যাল মিডিয়াকে এই ভিডিও সরিয়ে নিতে বলল।

আমি গেট থেকে বেরিয়েছিলাম আটককৃত একজনের — যিনি পিডব্লিউডি শিক্ষার্থী — চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু দিল্লিপুলিশ আমাকেও আটক করে জাফরপুর কালানথানায় নিয়েগেল। মাঝরাতে আমাদেরকা পাশেরা থানায় স্থানান্তরিত করা হলো এবং সারারাত আমলাতান্ত্রিক নির্যাতনের পর সকালে জানানো হলো, ১৪ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে।

মাননীয় সুপ্রিমকোর্টের ইউজিসি ইকুইটি রেগুলেশনে স্থগিতাদেশের পর সারাদেশে যে আন্দোলন জ্বলে উঠেছিল, এটাছিল তার উপর এক বড় আঘাত।

তিহারের ৪ নম্বর কারাগারে ঢুকতেই এক পুলিশ অফিসার আমাদের বসতে বলে বলল, "নিচে বইঠ যা।" সে নিজে অনেক উঁচু চেয়ারে বসে, আর আমাদের মেঝেতে পা ভাঁজকরে বসতে বলাহলো ।এটাছিল লজ্জাজনক এবং অপমানকর । মারি সেলভারাজের ছবি 'মা মান্নান'-এর সেই

দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল, যেখানে একজন দলিত ব্যক্তি তার এলাকার উচ্চবর্ণীয় সামন্ত জমিদারের কাছে গিয়ে মেঝেতে বসতে বাধ্য হয় । কারাগার কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, এটা আধুনিক শহরে সামন্তবাদী শাসনের প্রতিরূপ। আমাদের একজন বন্ধু সেখানে রাখা একটি টুলে বসতে চেষ্টা করলে, এক পুলিশ অফিসার অত্যন্ত চড়া গলায় চিৎকার করে উঠল, তামিজসে বসতে বলল।

পরে, ভেরিফিকেশনের অপেক্ষায় লবিতে থাকার সময়, আমি এক পা অন্যপায়ের ওপর তুলে বসেছিলাম — আমি সাধারণত যেভাবে বসি। আবারকে উচড়া গলায় চিৎকার করে উঠল, "পা মাটিতে রাখ, জেল আয়া হ্যায় তু।" আমাদের পকেটে হাত রাখতে বা কোমরে হাত দিতে, বা দু'হাত ভাঁজ করে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেও দেওয়া হলো না।

কারাগারের ভেতরে প্রথম যা কানে এলো তা হলো, পুলিশ কর্মকর্তা ও বন্দী উভয়ের পক্ষথেকেই গালাগালও অবমাননা দস্তুর। এই গালিগুলো সবসময় মা-বোনের দিকে এবং তাদের শরীর নিয়েছিল। এটাছিল লজ্জাজনক এবং ভয়াবহ যে পুলিশ কর্মকর্তারা ও এভাবে কথা বলছিল।

আমি কারো প্রতিবিশেষ ভাবে নির্দেশিত গালির কথা বলছি না । কিন্তু দু'মিনিটও যদি কারাগারে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তাহলেই ডজন ডজন গালি শুনতাম। হিংসা সব সময় শারীরিক নয় । কারো মা-বোনকে উদ্দেশ করে গালি শোনা আমাদের সকলের মা-বোনের অপমান।

কারাগারের পুরো পরিবেশ এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। কেউ বলতে পারে এটা প্রাতিষ্ঠানিক নয় যদি শুধু বন্দীরা বলে, কিন্তু যখন যারা সংস্কারের জন্য দায়িত্বশীল তারাই এটাকে তাদের অফিসিয়াল ভাষার মতো ব্যবহার করে, তখন এটা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে যায়।

আমাকে ওয়ার্ড নম্বর ১- এর ব্যারাক নম্বর ১-এ বরাদ্দ দেওয়াহলো ।জেএনইউ-১৪-এর একজন বাদে বাকি সবপুরুষকে আলাদাওয়ার্ডে পাঠানোহলো। শুধু কমরেড ভার্কিওয়ার্ড১-এছিলেন, তবে ব্যারাক ৫-এ।

ওয়ার্ডে প্রথম ঢুকতেই দায়িত্বরত বন্দীরা জিজ্ঞেস করল, আমরা জেএনইউথেকেজেনে: "কেন করতে হো ইয়ে সব প্রোটেস্ট?" তারা একটু আগেই লাইনভাঙার দায়ে ছাড়া পাওয়া একবন্দীকে মেরেছিল ও গালি দিয়েছিল।

জেএনইউয়ের কথাশুনে কারাগারে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া হলো। কেউ আমাদের কাজের প্রশংসা করলও সরকারকে গালিদিল, কেউ আমাদের কাজকে সমর্থন করলেও এসবে না জড়াতে পরামর্শ দিল। স্ক্যানিং প্রক্রিয়ায় যখন জানাগেল আমরা জে এনইউ থেকে, তখন আমাদের আসামির মতো ব্যবহার করা হলো — যেন কোনো তদন্ত, বিচার বা চার্জশিট ছাড়াই । অফিসাররা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জেএনইউনিয়ে কিছু বলল না, কিন্তু বন্ধুদের জিজ্ঞেস করা হলো: "দেশকে খিলাফনারে বাজি কিয়েহো?" "অ্যান্টি-ন্যাশনাল হোক্যায়া তুমলোগ?"

কারাগার ছাড়ার সময়কেউ আবার জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছিলাম। বললাম, ভিসির জাতপাতের মন্তব্যের বিরুদ্ধে এবং তাঁর পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ করেছিলাম। সে জিজ্ঞেসকরল, "জেলটা ভালো লাগল? আবার আসতে চাও?" আমি উত্তর দিলাম, আমরা শুধু নিজেদের অধিকারের জন্য প্রতিবাদ করি; কে জেলে আসতে চায়? আমরা প্রতিবাদ করি, সরকার আমাদের জেলে পোরে। সে সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছ।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পরিবারকে খবর পাঠাতে সাহায্য দরকার কিনা।সে বলল, "না, না।"

প্রথম দিনযারাএসেছিল, তাদের সঙ্গে আমাকে বিকেল ৩টায় পরিষ্কারের কাজে ডাকা হলো। আমি ঝাড়ু তুলে ময়লা ঝাড়লাম। ডাস্টবিনও পরিষ্কার করলাম। ব্যক্তিগতভাবে এইকাজে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু

স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার প্রশ্ন আছে। বন্দীদের দস্তানা বা মাস্ক না দিয়ে এইকাজে লাগানো হয়। আমাদের কাউকে দস্তানা বা মাস্ক দেওয়া হয়নি।

টয়লেট পরিষ্কারের দায়িত্ব কারছিল জানি না, তবে নিশ্চিত তাদের ও দস্তানা দেওয়া হয়নি।

আমি যে ব্যারাকে ছিলাম সেখানে প্রায় ১৫০ জন।এই ওয়ার্ডকে মুলায়জাবলা হয়, অর্থাৎ প্রথমবার আসা। ব্যারাক ও ওয়ার্ডের বেশিরভাগ মানুষ প্রথমবার কারাগারে আসা।

এমনকি কারাগারের ভেতরে ও পুরনোবন্দীদের জায়গা ভালো, নতুনরা পেল "হাইওয়ে" — মাঝখানের জায়গা যেখানে শুধু একপাশ হেলান দেওয়া যায়। পিঠের উপর শুয়ে থাকার উপায় নেই।

দ্বিতীয় রাতে — যেটা শনিবার ছিল — আমাদের সেলে ১৬৫ জনবন্দী। সরকার দাবি করে তিহার বিশ্বের বৃহত্তম কারাগার কমপ্লেক্স, কিন্তু দিল্লি সরকারের কেন্দ্রীয় জেলের ওয়েবসাইটই স্বীকার করে প্রায় ৯,০০০ বন্দী স্বীকৃত ধারণ ক্ষমতার বাইরে আছে। বসার বা পড়ার জায়গা খুঁজলে পাবেন না।

আমাদের জেলগুলো ভর্তি মুসলিম, দলিত, আদিবাসী এবং বহুজনদের দিয়ে। যেকোনো ঘোষণায় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের নাম প্রায় নিশ্চিতভাবে মুসলিম। ভারতীয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় — দলিত-আদিবাসী- বহুজন –মুসলিম — কারাগার ছাড়া আর কোথাও যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব পায়না। আমার সঙ্গে একব্যক্তির দেখাহলো যাকে আদালত থেকে সরাসরি তিহারে পাঠানো হয়েছিল ।তার ফোন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, কাউকে ফোনও করতে পারেন নি। জামিন হয়েছিল কিন্তু জামানত ভরার কেউ ছিল না। পিআইডি নম্বরের মাধ্যমে এক-সময়ের ফোন সেবার জন্য পাঁচদিন অপেক্ষা করতে হলো।

আদালতে হাজির হলে সম্মানীয় বিচারক বললেন জামিন মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু আগে পুলিশ আমাদের ঠিকানা যাচাই করবে। তারপর আমাদের তিহারে পাঠানো হলো।

আমাদের প্রত্যেকের হাত ধরার জন্য একজন করে পুলিশ দেওয়া হলো যেন পালাতে না পারি । তিহারে ঢুকতে ঢুকতে মনে হচ্ছিল একদিন বা পরের দিনের মধ্যে বেরিয়ে যাব। কিন্তু দুইরাত থাকলাম, তৃতীয় রাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। জেলে যখনই ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠত, উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, খালিদ সাইফি, গুলফিশা, জি এন সাইবাবার লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দিতাম নিজেকে। তাদের কেউ কেউ বছরের পর বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। জেলের ভেতরে উমরের লেখা ডায়েরির কথামনে পড়ত। তাদের সংগ্রাম অনুপ্রেরণার উৎসছিল, কিন্তু তারা কারাগারে যে অসম্ভব দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন — ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে । কোনো শব্দে, কোনো সংহতিতে তাদের সাহস ও দৃঢ়তার ঋণ সত্যিকার অর্থে শোধ হওয়ার নয়।

তৃতীয় দিনের রাতে আমাকে ব্যারাক থেকে বারান্দায় সরানো হলো। ঘুমানোর আগে এক বন্দীর কাছ থেকে সর্ষের তেল নিলাম। রবিবার ছাড়া পাব বলে আমরা মনে করিনি। ড্রাগ মামলায় আসা এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে জিজ্ঞেস করল, "ক্যায়া মোদি সরকার আচ্ছা কররহি হ্যায়?" বুঝলাম সে মোদিকে পছন্দ করে না, কিন্তু মোদি সমর্থক মনে করলে প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে ভয়ে জিজ্ঞেস করছে। আমি বললাম, "মায়াইহাঁহুঁকি উঁকিমেনে মোদিকেদ্বারা চুনিহুই ভাইসচ্যান্সেলরকা বিরোধকিয়াথা।" সে স্বস্তি পেল।কথামাত্র শুরু হয়েছে, এমন সময় ঘোষণা শুনলাম: "এক কি একসে নিতীশকুমার।" দ্রুত উঠে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরনো বন্দীরা ডাকল, কারাগারের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইল, কেউ বাইরে বার্তা পাঠাতে বলল।

কারাগার থেকে বেরিয়ে তিহারের মাটি নিয়ে গেলাম। জেএনইউ ফিরে সেই মাটি রেখে একটি সংহতি সভায় দুর্নীতিগ্রস্ত, জাতপাতবাদী ভিসিকে বললাম: "ম্যাডামভাইস- চ্যান্সেলর, আমরা মনেরাখব যে আপনি আমাদের জেলে পাঠিয়েছিলেন কারণ আমরা আপনার পদত্যাগ দাবি করছিলাম আপনার জাতপাতের বক্তব্যের জন্য। আপনি আমাদের জেলে পাঠিয়েছিলেন কারণ আমরা রোহিত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ইউজিসি বিধিমালার দাবি করছিলাম । আপনি আমাদের জেলে পাঠিয়েছিলেন কারণ আমরা আমাদের ইউনিয়নের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে লড়ছিলাম। আপনি আমাদের জেলে পাঠিয়েছিলেন কারণ আমরা গ্রন্থাগারে নজরদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলাম। কিন্তু একটা কথামনে রাখবেন — এখন জেএনইউতে তিহারের মাটি আছে। আপনি আমাদের মাথা ভাঙতে পারেন, পা ভাঙতে পারেন, জেলে পাঠাতে পারেন — কিন্তু আমরা ভয় পাইনি, এবং ভয় পাব না। আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেব এবং তা প্রতিষ্ঠা করব।

অনুবাদ - তীর্থরাজ ধর

লেখাটি লিবারেশন, এপ্রিল, ২০২৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী প্রতিবছরের মত এবারও উদযাপিত হয়েছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। এই উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের কিছু গদ্য এবং নজরুল ইসলামের উপর লেখা কিছু গদ্যাংশ সংকলিত করা হয়েছে। কাজী নজরুলের কলম তরবারির মত শানিত ছিল গদ্যে ও পদ্য। এই সময় কাজী নজরুল অপরিহার্য।

ছুতমার্গ

- **কাজী নজরুল ইসলাম**

কথা হইতেছে, আদত রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়াছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোনো ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোনো ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কোনো একটা ধর্ম কখনও এত সংকীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোনো ধর্ম শুধু কোনো এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুতমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা

মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারি। মানুষের সৃষ্টিশৃঙ্খলা বা সমাজবন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই 'সম্ভবামি যুগে যুগে' রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও হাদিসে সেই জন্য প্রতি শত-বর্ষে একজন করিয়া 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। 'বেদাৎ' বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এক সংস্কারকদের মহান লক্ষ্য।

হিন্দুধর্মের মধ্যে এই ছুতমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মতো একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি।

আমরা যে তাঁহাদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উলটাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সত্য হয়তো একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কি আর মুক্তি হইবে না? বাংলার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়! মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কী উদার সুন্দর কথা। মানুষের প্রতি কী মহান পবিত্র পূজা। আবার সেই ধর্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মতো হেয় জঘন্য এই ছুতমার্গবিধি! কী ভীষণ অসামঞ্জস্য! আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহনপুত কালাপাহাড়ের দলকে সেই জন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি, এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধিবন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে, 'আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!' আমরা যে ধর্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে,

আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকারভাবে স্বধর্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপন হইতেই আসে। যত ছোঁয়াছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বকধার্মিক আর বিড়ালতপস্বীদলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা এক ট্রেনে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দনধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায় ।

টুপি ও পঙ্গ দেখিয়াই ছোঁয়া খাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পণ্ডিতজি বেদ বা ওই রূপ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া ওই ভদ্রলোকদের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কাণ্ড দেখিয়া চড়কগাছ। আমরাও তখন সহজ হইয়া পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পণ্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলতিলক হইয়াও কী করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়া কেন একেবারে দশ হাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ বাবা, আমি হিন্দু ধর্মকে ভালোবাসি ও সত্য বলিয়া জানি বলিয়া বিশ্বের সকলকে, সকল ধর্মকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোনো ধর্ম নাই। তবে ধর্মের যে ঘটাটা দেখ,

তাহা অন্তরের দীনতা-হীনতা ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।' ইহা বানানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা

- কাজী নজরুল ইসলাম

সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজটরাজ বুঝি না, কেন না ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবেনা। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকাপুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু ছাড়তে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়মকানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

'ধূমকেতুর পথ' নামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় (১৩ অক্টোবর, ১৯২২) থেকে কিছুটা উদ্ধার এখানে করা হল তাঁর চিন্তার ও বাক্যের বলিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত হিসেবে ।

সঞ্চিতা: বাজেয়াপ্তের বিজ্ঞপ্তি লেখা হয়েও সই হয়নি

- শিশির কর

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সমাজ ও মানুষের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা নজরুলের কবিতাকে রাঙিয়েছে নানা রঙে। পরাধীন দেশের বেদনা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, সমাজের নানা ভন্ডামি ও সংস্কার; ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও

আর্থিক শোষণ প্রভাবিত করেছিল তাঁর কবি-মনকে। নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের কথা তিনি যেভাবে বলেছেন, খুব কম কবিই তেমন পেরেছেন। তাঁর অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ফণি-মনসা, সর্বহারা, ভাঙার গান, প্রলয়-শিখা, চন্দ্রবিন্দু, সঞ্চিতা বাঙালিকে প্রবল উদ্দীপনা জুগিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে মুক্তি সংগ্রামে। তাই তো তাঁর একটার পর একটা বই ব্রিটিশ সরকারের রোষে পড়েছে, বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অভিযুক্ত হয়েও বাজেয়াপ্ত হতে হতে রয়ে গিয়েছে অনেক বই। তাঁর ওইসব লেখা শুধু সমসময়ের মানুষকেই উদ্‌বুদ্ধ করেনি, আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামেই শুধু তাঁর লেখা অসির ঝংকার তোলেনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও এইসব কবিতা ছিল সংগ্রামী হাতিয়ার। তিনি বিদ্রোহী কবি। তাঁর বিদ্রোহ সব রকম অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তাই তাঁর কবিতা দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে বঞ্চিত-নিপীড়িতদের অবিচলিত সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করবে। 'লোভীর নিষ্‌ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ' যত দিন থাকবে, তত দিন উৎপীড়িতের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে তাঁর কাব্য।

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নি-বীণা-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিদ্রোহী'। অগ্নি-বীণার প্রথম প্রকাশ ১৯২২ সালে। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এর আগেই প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'-তে প্রায় একসঙ্গে বার হয় 'বিদ্রোহী' ১৩২৮ সনের কার্তিক-পৌষে। ওই বছরই 'প্রবাসী'তেও 'বিদ্রোহী'র অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হয়েছিল। কলকাতার পাঠকরা 'বিদ্রোহী' প্রথম পড়ে ১৩২৮ সনের ২২ শে পৌষ-'বিজলী'তে। কারণ 'মোসলেম ভারতে'র যে সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২৮) 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাপা হয়েছিল, সেটি বার হয়েছিল পৌষের শেষদিকে।

অগ্নি-বীণার অনেক পরে নজরুল বার করেন এই সঞ্চিতা। একে তাঁর চতুর্দশ কাব্যগ্রন্থ বলা যায়। সঞ্চিতা কোনো নতুন কাব্যের বই নয়, পূর্বে প্রকাশিত কবির কয়েকটি কাব্যের সংকলন গ্রন্থ এটি। কবি নিজেই এই সং

কলন করেন। তাঁর পূর্বপ্রকাশিত যে-সব কাব্যগ্রন্থের কবিতা এই সংকলনে আছে, তা হল:

অগ্নি-বীণা (১৯২২), দোলন-চাঁপা (১৯২৩), ছায়ানট (১৯২৪), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), চিত্তনামা (১৯২৫), ঝিঙে ফুল (১৯২৬), বুলবুল (১৯২৮), জিঞ্জির (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), চোখের চাতক (১৯২৯), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজরুল-গীতিকা (১৯৩০)

(চক্রবাক, সন্ধ্যা, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুল-গীতিকার কবিতাগুলি নিশ্চয়ই 'সঞ্চিতা'র প্রথম সংস্করণে ছিল না, পরে অন্তর্ভুক্ত হয়।)

বিদ্রোহীকে নিষিদ্ধ করার সাহস হয়নি ব্রিটিশদের

সঞ্চিতার প্রথম সংস্করণ বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২৮ সালে বার হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয় ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে। অগ্নি-বীণার মতো সঞ্চিতার প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী'। যে সব কবিতার জন্য অগ্নি-বীণা ও সঞ্চিতাকে বাজেয়াপ্ত করতে চাওয়া হয়েছিল, সে সবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা এই 'বিদ্রোহী'। কিন্তু নানা কারণে এই দুটি গ্রন্থকে এবং 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে আইনের বেড়াজালে বাঁধা যায়নি।

নজরুল 'বিদ্রোহী' লিখেছিলেন মাত্র ২১ বছর বয়সে। এর আগে এত কম বয়সে কেউ বাংলা সাহিত্যে এত গভীর দাগ কাটতে পারেননি। সত্যিই 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য-জগতের কাছ থেকে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেয়। (প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'নজরুল স্মৃতি', পৃ ৭৩)

'বিদ্রোহী' কি কবিতা? না আগুনের গোলা? বাঙালির শিরায় শিরায় বয়ে গেল তরল অনল।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন ভাষায় আর কোনো বাঙালি কবি চ্যালেঞ্জ জানায়নি। রাজশক্তি স্বভাবতই এই কবিতা বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সচকিত হয়ে উঠেছিল। উৎপীড়ক সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির বিরুদ্ধে কে এমন ভাষায় গর্জে উঠেছেন? 'বিদ্রোহী'র লেখক কে? রক্তচক্ষু সরকারি আমলারা বেসামাল। আমলাদের সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন গোয়েন্দারা, সরকারি আইন-বিশারদরাও। কিন্তু কোনো আইনেই সেদিন 'বিদ্রোহী'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া গেল না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখায় আমলাদের সেই অসহায় অবস্থা সুস্পষ্ট।

এ কবিতায় হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই এত পুরাণ প্রসঙ্গ ঢুকেছে যে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি একে রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত করতে পারল না। কখনো ঈশানবিষাণের ওঙ্কার বাজছে, কখনো বা ইস্রাফিলের শিঙ্গা থেকে উঠেছে রণহুঙ্কার। কখনো বা হাতে নিয়েছে মহাদেবের ডমরু-ত্রিশূল, কখনো বা আর্ফিয়াসের বাঁশি। কখনো বাসুকীর ফণা জাপটে ধরেছে। কখনো বা জিব্রাইলের আগুনের পাখা, কখনো চড়েছে 'তাজি বোররাকে' (পঙ্খীরাজ ঘোড়া) কখনো বা উচ্চৈঃশ্রবায়।

একে রাজদ্রোহ বলতে গেলে ধর্মের উপরে হাত দেওয়া হবে।

নজরুলের অগ্নি-বীণা ও সঞ্চিতাও সরকারি রোষে পড়েছিল এই 'বিদ্রোহী'র জন্যই। নজরুল তাঁর প্রিয়তম কবিতাটি এই দুটি কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম কবিতা হিসাবে ছেপেছিলেন। কিন্তু আইনের বেড়াজালে এদের বাঁধা যায়নি। কেন? 'বিদ্রোহী' প্রসঙ্গে সরকারের এই অসহায়তার কথা উল্লেখ করেছি আইনজ্ঞ-সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমারের উদ্‌ধৃতি দিয়ে। আরও বহু অজানা তথ্য ছড়িয়ে আছে সরকারি নথিপত্রে, আমলা আইনজ্ঞদের মন্তব্যে। তার কিছু লাল-ফিতার বজ্র-বাঁধন থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি।

অগ্নি-বীণা ও সঞ্চিতা, যার প্রথম কবিতা এই 'বিদ্রোহী', অনেকের ধারণায় এই দুটি বই-ই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এমনকী ড. সুশীলকুমার গুপ্তের

মতো গবেষকও এই ভুল করেছেন। তিনি তাঁর নজরুল-চরিতমানস গ্রন্থে লিখেছেন যে, অগ্নি-বীণা বাজেয়াপ্ত হয়। সঞ্চিতা সম্পর্কেও এই ভুল ধারণা আছে। বাজেয়াপ্ত না হলেও অগ্নি-বীণা ও সঞ্চিতা সরকারের বিষ নজরে ছিল।

তল্লাশির সময় কারও কাছে এই দুটি গ্রন্থ দেখলেই গোয়েন্দা, পুলিশ, আমলাদের চোখ লাল হয়ে যেত। এরকম বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় যে, এই সব বই রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এমনকী মামলাও দায়ের করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদ দমন আইন অনুসারে। এ সম্পর্কে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিভাগে একাধিক ফাইল আছে। সেইসব ফাইল থেকে এ যাবৎ অপ্রকাশিত অথচ বহু মূল্যবান তথ্য এখানে তুলে ধরছি।

কাজী নজরুল : সকল দেশের, সকল মানুষের

ভারতীয় রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেনি। নজরুল সংকীর্ণ পরিবেশ ও সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। তাঁর কবিতার আবেদন যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তজ্জন্য তিনি একই সঙ্গে আল্লাহ্-ঈশ্বর, মসজিদ-মন্দির-গির্জা, মোহম্মদ-কৃষ্ণ, খালেদ-অর্জুন, কোরান-বেদ-বাইবেল প্রভৃতির রূপক উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম। এ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন, 'এঁরা কি মনে করেন হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কোনকালেই সম্ভব হবে না-জৈগুন বিবির পুঁথি ছাড়া।... বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানীর রাগ করা অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাঁদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কুঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাঁদের

সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই।'

নজরুলের সাম্যবাদ কেবলমাত্র তাঁর কাব্যের অলংকার কিংবা রাজনীতির স্লোগানমাত্র ছিল না। উপমহাদেশের চরম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও তিনি অবিচলিত অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। নিজেকে তিনি সর্বদাই জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অদ্বিতীয়। তিনি বলেন, 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের, আমি বলি, ও দু-টোর কিছুই নয়।' শুধু ধর্মীয় কেন, ভৌগোলিক জাতীয়তাও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের এই সমাজের নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্ম গ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।' একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে নজরুল সর্বত্রই মানুষকে ধর্ম ও জাতীয়তার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনে হিন্দু নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ তাঁর অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের নামকরণেও সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। সমাজজীবনে সাম্য ও উদারতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। ধ্যানমগ্ন নজরুল-মানসেরও এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা লক্ষ করি। ১৯৪১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র রজতজয়ন্তী উৎসবে কবি তাঁর জীবনের লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করলেন। 'হিন্দু-মুসলমানের দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব-অন্য দিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে-এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে কর্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।'

একটি অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত

– **অলকানন্দা চৌধুরী**

বিশাল জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষে জন্মনিয়ন্ত্রন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রতিহত করাই ছিল স্বাভাবিক। অন্তত দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা তাই বলে। তবে ইদানীং আমরা শুনতে পাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের সাফল্য নাকি কোথাও কোথাও অন্য কিছু সমস্যা তৈরী করছে যা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের জন্য প্রার্থিত নয়। এসবের মধে অতি সম্প্রতি শোনা গেল ভারতের সপ্তম বৃহত্তম রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে জন্মহার কমে যাওয়া নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত বয়ে আনছে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫ যা আসলে থাকা উচিত ছিল ২.১। এর ফলে কোন একটা সময় দেখা যাবে নতুন জন্ম কমে যাওয়ার কারণে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমবে এবং বৃদ্ধ বা কর্মক্ষমতা হারানো মানুষের সংখ্যা বড়বে। এর ফলে সামাজিক, আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এই অবস্থার নিরসন কল্পেই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু একটি জনসভায় ঘোষণা দিয়েছেন, জন্মহার বৃদ্ধির জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য দেবার পরিকল্পনা করেছে। পরিবারে দুই এর পর তৃতীয় সন্তান এলে ৩০ হাজার টাকা এবং চতুর্থ সন্তান এলে ৪০ হাজার টাকা করে কর অর্থ সাহায্য করা হবে। এই ঘোষণাটিকে চুলছেড়া বিশ্লেষণষ করা অতন্ত জরুরী কারণ এর, ফলাফল কিন্তু বহমুখী যার সবগুলোই যে ইতিবচক তা কিন্তু নয়।

সাধারণভাবে গরিব এবং প্রান্তিক শ্রেণীর পরিবারগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রন বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে মেয়দের মতামতকে কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। একথা ধনাঢ্য পরিবারেও কখনো কখনো প্রযোজ্য। এই অবস্থায় শারীরিকভাবে দুর্বল কন্যাটিকেও হয়তো পরিবার অথবা স্বামীর চাপে একটি দুটি নয় চারটি সন্তান জন্ম দেওার দায়িত্ব পালন করতে হবে। দুর্বল, অপুষ্টিতে ভোগা মেয়েটিও অপুষ্ট শিশুরই জন্ম দেবে যা দেশের জন্য সম্পদ নয় বোঝা হয়েই উঠবে। জন্মের পর এককালীন এই অর্থ সাহায্য একটি

শিশুর সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য কখনোই যথেষ্ট নয়। যথার্থ মানুষ হয়ে উঠার জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে জে অর্থ ব্যয় করার কথা গরীব পরিবারগুলো সেটা করতে পারবে না স্বাভাবিক ভাবেই। সন্তান লালন পালনে তার জন্মদাত্রী মায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায় কিন্তু মায়ের কাঁধেই তুলে দেওয়া হবে। চারটি সন্তান জন্মের পর পিতা অন্যত্র বিবাহ করে হয়তো আবার চারটি সন্তান জন্ম দিতে আগ্রহী হবেন এবং সে ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কি হবে কারো জানা নেই। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার-এ গতি আনার জন্য শ্রমক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদানকে যখন অনিবার্য বলে ভাবা হচ্ছে ঠিক তখন চারটি সন্তান জন্ম দেওয়ার উৎসাহ দিয়ে মেয়েদেরকে আবার গৃহকোণে আবদ্ধ করা হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

এই দ্বিমুখী টানাপোড়ায় নারীর সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার অন্তরায় হবে। অথচ সরকার এ বিষয়ে উদাসীন। শোনা যাছে এই সব শিশুদের ভবিষ্যত জীবনকে সুসংহত ও সসার্থক করে তোলার জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যেমন ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, পুষ্টিপ্রকল্পে আর্থিক সহায়তা, ইত্যাদি। কিন্তু এই সবই প্রস্তাব হিসেবে বিচেনাধীন । এর মীমাংসা খুব শীঘ্র হবে বলে কোন সম্ভাবনা নেই। এরই মধ্য ঘোলাজলে মাছধরার অভিপ্রায়ে অনেকেই উদ্যোগী হয়েছেন। সম্প্রদায়িক বিভাজনই যাদের কাম্য সেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর কাছে দাবি জানিয়েছে , আর্থিক সহায়তা শুধুমাএ হিদু দম্পতিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক। ভি.এইচ.পি.-র মতে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রনের কঠোরতা মুসলিম বা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা অমান্য করেছেন। কেবলমাত্র হিদুরাই পরিবার সীমিত রেখেছেন। অতএব এই সহায়তা সকলের জন্য চালু হলে রাজ্যের জন বিন্যাস বদলে যাবে। পরিস্থিতি বিচার করে বলা যায় সকলেই নিজেদের স্বার্থ এবং সুবিধা অনুযারী কাজ করছেন কিন্তু এর সুদূর প্রসারী ফলাফল নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ও আলোচনায় আসছে। সেটি হলো ভিলিমিটেশন বিষয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের নীতি। জনসংখ্যা অনুসারে লোকসভায় প্রতিনিধি সংখ্যা যদি নির্ধরিত হয় তাহলে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের রাজ্যগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা কমে

যাবে কিন্তু বিহার, উত্তর প্রদেশ, ইত্যাদি বিশাল জনসংখ্যার রাজ্যগুলি লাভবান হবে। এটা দক্ষিণ প্রান্তের রাজনীতিতে আশঙ্কা জাগিয়েছে , যে অদূর ভবিষ্যতে সংসদে তারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন অন্তত সংখ্যার বিচারে। এর মোকাবেলা করার জন্য হয়তো ক্ষমতাসীন শাসক যেমন চন্দ্রবাবু নাইডুরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই হাতিয়ার করেছেন। অথচ এর খেসারত দিতে হবে রাজ্যের মানুষদের বিশেষ করে মেয়েদের। সন্তান জন্ম এবং লালনের মূল দায়িত্ব পালন যারা করে এবং আগামী দিনেও করবে তারা নিজেদের অজান্তেই রাজনীতির ঘুঁটি হয়ে যাবে। এই অসহনীয় পদক্ষেপ তাদের জীবনকে করবে দুর্বিষহ যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আবেগ নয় যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েই এই ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করা জরুরী। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই পরিস্থিতি প্রতিহত করার কাজে উদ্যোগী হবেন বলেই আশা রাখছি।

সর্বোচ্চ আদালতে জয়ী নয় বিজয়ীকে অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের সংবর্ধনা

মানবাধিকার : প্রতিবাদে ও উদযাপনে টি এইচ আর ও

- মনিময় রায়

বনমালীপুরে পুত্র সহ এক মহিলা আক্রান্ত: পাশে দাঁড়ালো টি এইচ আর ও: উচ্চ আদালতের সিট গঠন

বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে পুরসভার কর্মীকে ঘুষ দিতে হবে।এই আবদার না মানা হলে বাড়িতেই বাড়ির মালিককে লাঞ্ছিত হতে হবে! এমন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে শহর আগরতলার প্রায় কেন্দ্রস্থল বনমালীপুরে। ঘটনায় আক্রান্তের পাশে দাঁড়িয়ে এই আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করেছে ত্রিপুরা মানবাধিকার সংগঠন বা টি এইচ আর ও। সংগঠনের সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ এই ঘটনার উল্লেখ করে জানান, গত ৪ঠা এপ্রিল বনমালীপুর নিবাসী রত্না রায়ের বাড়িতে ঐ ঘটনা ঘটেছে। শ্রীমতি রায় নিজের নির্মিয়মান বাড়িতে কাজ করাচ্ছিলেন,তখন রবীন্দ্র নারায়ন ঘোষ নামের পুরসভার একজন টাস্কফোর্সের কর্মী বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বাড়ির মালিক রত্না রায়ের ছেলে সৈকত সাহার কাছে দু লাখ টাকা দাবি করেন। সৈকত ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে রবীন্দ্র নারায়ন ঘোষ ও জয়দেব ঘোষের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী ঐদিন গভীর রাত্রিতে ঐ বাড়িতে ঢুকে আক্রমণ চালায় ও সৈকতকে ব্যাপক মারধর করে।ছেলেকে বাঁচাতে এসে বৃদ্ধ বাবা ও মা আক্রান্ত হন।এরপর ঐ দুষ্কৃতীরা সৈকতকে মারতে মারতে পূর্ব থানায় নিয়ে আসে। সেখানে সৈকতের ওপর যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। সারা রাত সৈকতকে আটকে রেখে পরেরদিন (৫ই এপ্রিল) সৈকতের কাছ থেকে একটা মুচলেকা রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরেরদিন(৬ই এপ্রিল) রত্না রায় সমস্ত অভিযোগ জানিয়ে মহিলা থানায় ,পুর কমিশনার,

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে লিখিত অভিযোগের পরও এফ আই আর নথিভুক্ত করাতে পারেন নি। অবশেষে উচ্চ আদালতে রিট মামলা করা হয় । গত ৬ই মে আদালত নোটিশ জারি করার পরেরদিন এফ আই আর নথিভুক্ত হয় । উচ্চ আদালত থানার সমস্ত সিসি টিভি ফুটেজ সংরক্ষিত করতে সি জে এমকে নির্দেশ দেন। পুরুষোত্তম রায় বর্মণ আদালতে সৈকতের বেআইনি গ্রেফতার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ঘটনার বর্ণনা করেন । প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ একজন সাধারণ নাগরিকের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণের নিয়ে বিষ্ময় প্রকাশ করে পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্টকেই খারিজ করে দেন। সেই সাথে জেলার বাইরের একজন ডি এসপির নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে এই বিশেষ তদন্ত কমিটিতে পশ্চিম জেলার কোন স্তরের কোনো পুলিশ আধিকারিক থাকতে পারবেনা বলে আদেশে উল্লেখ করেন। উচ্চ আদালতের এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে পুলিশের আইন বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে বলে টি এইচ আর ও মনে করে।উচ্চ আদালতের এই রায়ে টি এইচ আর ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

অধিকারের জন্য সমস্ত লড়াইয়ের পাশে টি এইচ আর ও সর্বোচ্চ আদালতে জয়ী নয় বিজয়ীকে অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের সংবর্ধনা

অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে সবসময় ত্রিপুরা মানবাধিকার সংগঠন টি এইচ আর ও পাশে থাকবে।সেটা রাস্তায় হোক বা সেটা আদালতেই হোক। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আদেশে নয়জন অনিয়মিত কর্মচারী তাদের নিয়মিত করনের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের আগরতলার স্টুডেন্টস

হেল্থ হোমে সংবর্ধিত করলো অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে টি এইচ আর ও র সম্পাদক তথা ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ উপরোক্ত মন্তব্য করে বলেন এই লড়াকু জয় ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীদের পথ দেখাবে।এই জয়ী ৯ জন যোদ্ধা হলেন নিলতি রিয়াং, খানরাম রিয়াং, বনবতী ত্রিপুরা, মানকুমার চাকমা, সুনীল বিশ্বাস, কাঞ্চন সরকার,বিমল শুক্লবৈদ্য ও শুক্রধন চাকমা। এরমধ্যে মামলা চলাকালীন সময়ে শুক্রধন চাকমা প্রয়াত হন। তাঁর ছেলে সংবর্ধিত হন। এছাড়া আরও একজন গোপেন্দ্র শুক্ল বৈদ্য ছিলেন ধর্মনগর কলেজের গ্রুপ ডি অনিয়মিত কর্মচারী। ২০১৮ সালে সরকার বদল হবার পর ঐ কলেজের সরকার- স্তাবক প্রিন্সিপাল ,একদিন কলেজে এসেই গোপেন্দ্র বাবুকে মৌখিকভাবে ছাঁটাই করে দেন। গোপেন্দ্রবাবু উচ্চ আদালতে এর অবিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করেন।এই আবেদন মাননীয় উচ্চ আদালত গ্রহন করে ঐ মৌখিক আদেশ খারিজ করে দেন । গোপেন্দ্রবাবু নিয়মিতকরণ সহ চাকরি ফেরত পান। অন্যদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী রায় বর্মণ বলেন, বাকি আটজনের ক্ষেত্রে মাননীয় উচ্চ আদালতে সরকারের বক্তব্য ছিল "স্কীম নেই" যা পূর্বের সরকারের সময় ছিল।নব্য সরকার সেই স্কীম ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই বাতিল করে। নতুন স্কীম আনা হবে বলে আদালতে কথা দিয়েও আজও আনেনি।শ্রী রায় বর্মণ বলেন, ত্রিপুরা উচ্চ আদালত সরকারের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়ে এই আটজনের আবেদন খারিজ করেন। আবেদনকারীরা সুপ্রিম কোর্টে যান। সেখানে আইনজীবী অজিত প্রবীন ওয়াঘ ও বরিষ্ঠা আইনজীবী মারলেপালে বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের খরচে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়েন । ৩০ শে মার্চ সুপ্রিম কোর্ট আটজনের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে জানিয়ে দেয় "স্কীম খারিজ করা হয়েছে বলে কর্মচারীদের নিয়মিত করনের অধিকার কেড়ে নেয়া যায় না এই আদেশ বলে অনিয়মিত আট কর্মচারীকে ৩০ শে মার্চ ২০২৬ এ নিয়মিত করনের আদেশ দেন। সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবীকে কৃতজ্ঞতা

জানিয়ে পুরুষোত্তম রায় বর্মণ বলেন "তাঁরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা স্মরনীয় হয়ে থাকবে, এর ফলে বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা বাড়বে।" এই আট অনিয়মিত কর্মচারী ২০০৭ থেকে নিয়মিত করনের আওতায় আসবেন।এই আট কর্মচারীকে লড়াইএর ময়দানে নামিয়ে দেবার জন্য তিনি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, কর্মচারীদের নানাভাবে সমস্যায় ফেলতে সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বিনা সাফল্যের সাথে গত অর্থবছরে ৩৮কোটি টাকা খরচ করেছে । তিনি এই নিয়মিত করনের জন্য মঞ্চের আন্দোলন আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাস্তায় চালানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন , সম্পূর্ণ দাবি আদায়ের পর চল্লিশ হাজার অনিয়মিত কর্মচারী আগরতলায় বিজয় উৎসবে সামিল হবে। মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দেবনাথ বলেন , আমাদের এই লড়াকু সৈনিকরা হার না মানার যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথেই অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ রাস্তায় আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর। বক্তব্য রাখেন অঙ্গনোয়াড়ী কর্মী ও ঐক্য সহায়িকা সমিতির নেতৃত্ব প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সামন্তা সাহা। লড়াইয়ে জয়ী সকলকে অঙ্গবস্ত্র ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, ডঃ মিহির লাল রায়, মৃন্ময় চক্রবর্তী, নটরাজ দত্ত, আইনজীবী কৌশিক নাথ, আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য ও রতন দেবনাথ।

সাংবাদিক নিবেদিতার ওপর হামলা বাকস্বাধীনতার ওপর আক্রমন : টি এইচ আর ও

স্বাধীনভাবে কথা বলার ওপর যতবার আঘাত হানার চেষ্টা হবে ততবার ত্রিপুরা মানবাধিকার সংগঠন বাধা হয়ে দাঁড়াতে দ্বিধা করবেনা। রাজ্যের অন্যতম ব্লগার নিবেদিতা চক্রবর্তীর রামনগর ১১ নম্বরের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের হামলার পরে টি এইচ আর ও এর সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ নিবেদিতা

চক্রবর্তীর বাড়িতে দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য সুপরিচিত ব্লগার ও রাষ্ট্রীয় সমাচারের প্রধান সম্পাদিকা নিবেদিতা চক্রবর্তীর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি দেখে এসেছে। ঘটনার পরে টি এইচ আর ওর প্রতিনিধি দল নিবেদিতা চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে যা জেনেছে, ৯ই মে রাত্রিতে ৫০/ ৬০ জনের দুর্বৃত্ত দল এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে রাত্রি ১১ টা নাগাদ এই হামলা করে। প্রথমে বাড়ির গেট ভাঙে এরপর ভিতরে প্রবেশ করে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে।তার আগেই নিবেদিতা সাহস করে দুর্বৃত্ত দলের মুখোমুখি হন। তাদের ছোড়া পাথরের আঘাতে নিবেদিতা চক্রবর্তী পিঠে গুরুতর চোটও পেয়েছেন। এরপর নিবেদিতার দুই পোষা কুকুরের তাড়া খেয়ে দুর্বৃত্তরা নিবেদিতার বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে তাকে শাসিয়েছে "সামাজিক মাধ্যমে মুখ খুললে পরিবারের সবাইকে জানে মেরে ফেলা হবে।" দুর্বৃত্তদের মধ্যে মহিলারাও ছিল বলে অভিযোগ করছেন নিবেদিতা । নিবেদিতা জানান, থানায় এফ আই আর দাখিল করা হলেও এখন অব্দি এফ আই আর নথিভুক্ত হয়নি এবং কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে টি এইচ আর ও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেছেন, হুমকি দিয়ে ও প্রাণঘাতী আক্রমণ করে প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করা যায় না। জনস্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভীকভাবে মতামত রাখার জন্য নিবেদিতা চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সম্পাদক। নিবেদিতা ও নিবেদিতা কন্যা প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছে, বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার শুধু সংবিধানের পাতায় থাকলেই চলবে না,এই অধিকার রক্ষা করতেই হবে যেকোনো মূল্যে। বিষ্ময়করভাবে অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রতিবাদীরা। এখনো অব্দি এফআইআর নথিভুক্ত না করায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে টি এইচ আর ওর প্রতিনিধি দল জানিয়েছেন , সুবিচার পাওয়ার জন্য আক্রান্তদের লড়াইয়ে টি এইচ আর ও সর্বতোভাবে পাশে থাকবে। নিবেদিত চক্রবর্তীর মত সাংবাদিকরা মানুষের প্রকৃত কণ্ঠস্বর

এবং যারা রাতের অন্ধকারে, সরকারী বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে,দলবদ্ধভাবে মুখ কাপড়ে ঢেকে মা ও মেয়ের উপর আক্রমণ করে তারা কাপুরুষ ছাড়া কিছু নয়। এভাবে ভয় দেখিয়ে গনতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা যারা করছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে বলে টি এইচ আর ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। রাজ্যে বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার কতটা বিপন্ন নিবেদিতার উপর আক্রমণের ঘটনায় আবারও সামনে এসেছে বলে টি এইচ আর ও মনেকরে । প্রতিনিধি দলে সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ সহ ছিলেন মনিময় রায় ও কৌশিক নাথ।

নীট প্রশ্ন ফাঁস:পরিকাঠামো হীন এন টি এর উদাসীনতাই দায়ী : নীট ও এন টি এ কে পাকাপাকি বাতিলের দাবি করলো টি এইচ আর ও

এন টি এ পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা এই মুহূর্তে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন একে মানবাধিকার বিরোধী ও অসাংবিধানিক বলে মনে করে।টি এইচ আর ও এই মতামত দীর্ঘদিন ধরেই দিয়ে আসছে।২০২৪ সালের ৩রা জুলাই জয়েন্ট ফোরাম অন সেভ এডুকেশনের একসভায় টি এইচ আর ও র সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ এই এন টি এ র গঠন ও তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্বস্ততা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন।আজ তা আবার প্রমানিত হল। উল্লেখ্য এন টি এ পরিচালিত পরীক্ষা নিট ২০২৬ , প্রশ্ন পত্র ছাড়া ও বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৮৯ বার ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে ৪৮ বার পুনরায় পরীক্ষা নিতে হয়েছে। এবারের ২০২৬ , নীট ইউ জির প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ১৮জন ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। এতবড় একটা কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি হবার পরও

কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না । সরকার চুপ থেকে যেন এই দুর্নীতিকেই বাহবা দিয়ে যাচ্ছে।কিছু গ্রেফতার হলেও অদ্ভুতভাবে দায়িত্ব প্রাপ্তরা এখনও অভিযুক্তদের তালিকার বাইরে।প্রায় তেইশ লাখ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে টি এইচ আর ও একে মানবাধিকার বিরোধী বলে চিহ্নিত করে বলেছে,ছাত্র ছাত্রীদের বিরুদ্ধে এই কার্যকলাপ একটা অপরাধ ।উল্লেখ্য সারা ভারতে এই মুহূর্তে সরকারি মেডিকেল কলেজে একলাখ ছাত্রছাত্রীদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ রয়েছে।আর নীট পরীক্ষার্থী প্রায় ২৩ লাখ। এছাড়া সি ইউ টি ই, নেট সহ নানাধরনের পরীক্ষা মিলিয়ে ন্যাশনাল টেষ্টিং এজেন্সি (যাদের এখন ব্যঙ্গ করে বলা হয় নন ট্রাস্ট এজেন্সি)এই মুহূর্তে আশি লক্ষ থেকে এককোটি পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেয়।বিশাল অংকের টাকা তাদের খাজানাতে জমা হয়, যার অডিট করা বাধ্যতামূলক নয়। এই সংস্থার (,এন টি এর) একজনও নিজস্ব স্থায়ী কর্মী নেই।অন্য দফতরের ২২জন কর্মী ডেপুটেশনে আছেন।৪০জন আছেন চুক্তিবদ্ধ কর্মী।তিনজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আছেন যারা অন্য দফতর থেকে এসেছেন। সমস্ত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাই আউটসোর্সিং নির্ভর। এমনকি পরীক্ষক নিয়োগ, প্রশ্নকর্তা নির্বাচন করার কোন বিজ্ঞান সম্মত বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থাও করা হয়নি। একাধিক কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর বলা হয়েছিল , ইসরোর একসময়ের প্রধান কে রাধাকৃষ্ণণের সুপারিশ ক্রমে কাজ করছে এন টি এ। বাস্তবতা হচ্ছে উনার অধিকাংশ সুপারিশ মানা হয়নি।এই বিষয়গুলো করা পুরোপুরি দুর্নীতির জায়গা পাকা করতেই। টি এইচ আর ও লক্ষ্য করেছে যে ৩রা মে নীট ইউজির পরীক্ষা হলেও ৭ই মে এন টি এ জানতে পারে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে।এরও পাঁচ দিন পরে পরীক্ষা বাতিল করে। প্রথমতঃ কিভাবে তাঁরা জানতে পারলেন যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, তার ব্যাখ্যা যেমন পাওয়া যায়নি তেমনি কেন পরীক্ষা বাতিল করতে পাঁচ দিন সময় নেওয়া হলো তারও ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় নি। প্রশ্ন উঠেছে, মূল অপরাধীদের পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতেই কি এই কালক্ষেপ? আপাতত:

তদন্তে যা উঠে এসেছে তাতে আধা ডজন প্রশ্নকর্তা, একটি বিউটি পার্লার, একাধিক কোচিং সেন্টার প্রতারনার সাথে জড়িত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার চারদিন আগে 'গেস পেপার' নাম দিয়ে যে প্রশ্ন পত্র বাজারে এসে গিয়েছিল তার বাজার মূল্য ছিল ৫ লাখ টাকা।নীট তুলে দিয়ে 'এন টি এ' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি করেছে টি এইচ আর ও ।

নীট তুলে দেবার দাবী যুক্তিসঙ্গত। নীট সাংবিধানিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী। সমাজের উচু তলার প্রতি প্রচন্ড রকম পক্ষপাত দুষ্ট ব্যবস্থা। নিট অত্যন্ত প্রান্তিক অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ বিরোধী। আদিবাসী, দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র বিরোধী। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবেশিকার সুযোগ সমাজের ক্ষমতাবানদের কুক্ষিগত রাখার অস্ত্র নীট।

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা

- মিহির লাল রায়।

" বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা / আজ জেগেছে এই জনতা।। নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে। সেই নিপীড়িত জনগণের পাপের ধারে।। ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে/---- বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা/ আজ জেগেছে এই জনতা..... "

-- সলিল চৌধুরী

প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরীর কালজয়ী ও প্রতিবাদী গান "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা" গত শতকের সমাজ বাস্তবতায় রচিত হলেও ইদানিং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত মন্তব্য আমাদেরকে সেই গানটিকে স্মরণ করায়। যখন, দেশের একাংশ যুবক-যুবতিকে "আরশোলা"র সাথে তুলনা করায় নেট দুনিয়ায় বইছে ঝড়, আরেকটা মন্তব্য করলেন তিনি। এবার মন্তব্যটা দেশের পরিবেশ প্রেমিক নাগরিক সমাজকে লক্ষ্য করে।

গুজরাটের আমরেলি জেলার রাজুলা তালুকে পিপাভাব বন্দর সম্প্রসারণের ছাড়পত্রকে নিয়ে পরিবেশবাদীরা প্রশ্ন তুলেছেন। ২০১২ সালের দেওয়া ছাড়পত্রের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুনে শেষ হয়। সেটি ২০২৫, সালে নবায়ন হয়। পুনর্নবায়নের প্রাক্কালে ভেবে দেখার প্রশ্ন ওঠে। পরিবেশবাদীরা বলেছেন, বাস্তুতন্ত্রের উপর এর নানা নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তারা বলছেন পরিবেশগত ক্ষতিগুলি হলো - উপকূলীয় ক্ষয় ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি, মৎস্য সম্পদের হ্রাস, বায়ু দূষণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি, জলসম্পদ সংকট ইত্যাদি। মূল প্রকল্প এলাকার বনাঞ্চল, লবণাক্ত জলাভূমির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশ খনন(ড্রেজিং) ও পোর্ট ট্রাফিকের কারণে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র ও মাছেদের প্রজনন মারাত্মক হবে ব্যাহত হচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে মাছ শিকারের উপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন। কয়লা ও অন্যান্য ভারী ও বিশাল কার্গো ওঠানামার কারণে আশেপাশের এলাকায় বাতাসে কয়লার গুড়ো ছড়াচ্ছে।এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। তাদের অভিযোগ বন্দর সম্প্রসারণের জন্য পশুচারণ ভূমি (গোচর জমি) অধিগ্রহণের ফলে ওই অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ জলের উপর অতিরিক্ত চাপ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এসব কারণে প্রকল্পকে ঘিরে বন্দর লাগোয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন, যাতে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন না হয়। কিন্ত, গ্রীন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি খারিজ করে। এতে অসন্তুষ্ট মামলা কারীরা সর্বোচ্চ আদালতে গ্রীন ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। গত ১০ই মে, সর্বোচ্চ আদালতে মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও মাননীয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আপিলটি খারিজেই ক্ষান্ত থাকেননি প্রধান বিচারপতি । শুনানিকালে, পরিবেশবিদদের উদ্বেগকে খাটো করে, এমনকি উন্নয়ন বিরোধী হিসাবে জাগিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য তাঁর ।

আমাদের দেশে পরিবেশ নিয়ে এইসব মামলা দায়ের করা হয় শুধুমাত্র উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করতেই। তার এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা। যাদের মধ্যে রয়েছেন পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মী এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ আমলাদের সংগঠন " কনস্টিটিউশনাল কন্ডাক্ট গ্রুপ" ইত্যাদি। তাদের বক্তব্য , এই ধরনের মন্তব্য, তাও উচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ আসন থেকে, দেশের নাগরিকদের ও পরিবেশবিদদের আইনি অধিকার চর্চাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। তারা মনে করেন এমন মন্তব্য এসব মামলাগুলোকে উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত বারবারই প্রয়াস, যা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। তারা প্রধান বিচারপতির কাছেই লিখিত একটা চিঠিতে তাদের ক্ষোভ খোপ উগরে দিয়েছেন। এতে স্বাক্ষর করেছেন ৭১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত লেখক কলামিস্ট, মানবাধিকার কর্মী হর্ষ মান্দার, দিল্লির প্রাক্তন গভর্নর নাজির জং, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পরিবেশ সচিব মীনা গুপ্তা, প্রাক্তন বিদেশ সচিব কে রঘুনাথ প্রমুখ। চিঠিতে তারা বলেছেন , এটা দুঃখজনক যে, সর্বোচ্চ আদালত থেকে এমন পক্ষপাততুষ্ট(বায়াস)ও পূর্ব নির্ধারিত (প্রিজুডিস) মন্তব্য এসেছে। তারা লিখেছেন , কোন প্রকল্প যদি বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয় ডেকে আনে, যদি জনস্বার্থ বিপন্ন করে , যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ব্যাহত করে, তাহলেও প্রধান বিচারপতির এমন আপত্তিকর মন্তব্যের ফলে নাগরিকরা এ নিয়ে সোচ্চার হতে ভয় পাবে। যা গণতন্ত্রের জন্যও অনৈতিক। প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য লিখিত রায়ের অংশ না হলেও তারা তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। এই প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন যে, প্রধান বিচারপতি সরকারের পরিবেশ বিষয়ক বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির যেগুলো ইতিমধ্যেই নিজেদের কে সরকারের " রাবার স্ট্যাম্পে " পরিণত করেছে, তাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস (ব্লাইন্ড ফেইথ) মুক্ত হবেন। নাগরিক সমাজ, পরিবেশবিদদের, দেশের বাস্তুতান্ত্রিক বিপদ সম্ভাবনা থাকলে, ভয় দেখিয়ে চুপ না করিয়ে, এর বিরুদ্ধে সরব হতে উৎসাহীত করবেন।

এ দেশের পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন "ডাউন টু আর্থ"-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, গণতন্ত্রে আদালতের পরিবেশ প্রশ্নে আপত্তিকে আপদ হিসাবে গণ্য করা কাঙ্ক্ষিত নয়। তারা সংবিধানিক জবাবদিহীতার অংশ। তাদের এটা দেখতে হবে যে, উন্নয়ন প্রকল্প যাতে আইন সম্মত হয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভর হয় এবং সামাজিকভাবে ন্যায্য হয়। বিশিষ্ট পরিবেশ আইনবেত্তা নর্ম আলভেরস ফ্রন্টলাইনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, এটা দুঃখজনক যে, সম্প্রতিক সময়ে দেশের আদালতগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাগরিক সমাজের পরিবেশ বিষয়ক উদ্বেগ খতিয়ে দেখতে অনুৎসাহী। এমনকি ক্ষুন্নও হয়।

আদালতগুলো এটা ধরেই নে যে, প্রকল্পের জন্য সরকারে যথোপযুক্ত ঝাড়াই-বাছাই করেছে। কিন্তু সচেতন নাগরিকেরা, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা যখন দেখতে পায় প্রকল্পটি প্রধানত কর্পোরেট স্বার্থেই হাতে নেওয়া হয়েছে পরিবেশগত বাস্তুতান্ত্রিক অভিঘাতটা নজর আন্দাজ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অর্থ সামাজিক ক্ষতি ও হবে মারাত্মক, তারা প্রতিবাদ করে। সুরাহা না হলে আদালতের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু আদালত তেমন সংবেদনশীলতা দেখায় না।বরং প্রতিবাদী মামলাকারীদেরকে ভৎসনা করে। এই যে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পিপাভাভ বন্দর লাগোয়া এলাকার ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হল, তাদেরকে বস্তুত ভৎসনা করাটা কি মাননীয় বিচারপতির সঠিক হল? আমাদের সংবিধানে ২১ নং ধারায় স্বীকৃতি পেয়েছে "রাইট টু লাইফ"। অর্থাৎ বেঁচে থাকার অধিকার। সর্বোচ্চ আদালতেই তো পূর্ববর্তীকালে তাকে সম্প্রসারিত করে সুস্থ আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাহলে এখন তার ব্যতীক্রম হবে কেন? যদি নাগরিকরা এটা প্রত্যক্ষ করেন যে এই প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন সুস্থ আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার হারাচ্ছেন, মাঠ-গবেষণা, বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি সেটাকে সমর্থন করে, এই প্রেক্ষাপটে যদি নাগরিকরা

উদ্বেগ প্রকাশ করে ওই প্রকল্প বন্ধ করা কিংবা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন পুনর্বিচারের আর্জি জানান তাহলে দোষটা কোথায়? এক্ষেত্রে আদালতের সংবেদনশীলতা না থাকাটা কাম্য নয়। ভারতীয় সংবিধানের ৪৮(ক) ধারাটি পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর আইনের মাধ্যমে এটি রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র যদি সেই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানের ৫১ ক(জি) ধারা মূলে, সেখানে বলা হয়েছে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের রক্ষা ও উন্নয়ন করা ও সহানুভূতিশীল হওয়া, সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেন সর্বোচ্চ আদালতে তিরস্কৃত হতে হবে? আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রীন ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে যেখানে সংবিধানিক অধিকারেই আপিল করা যায়, সেই আপিল নিষ্পত্তিতে সংবেদনশীল মনোনিবেশের বদলে বিচারপতি যা করলেন তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

দেশজুড়ে যে প্রতিবাদ উচ্চারিত হচ্ছে, দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা সরাসরি চিঠি দিয়ে প্রধান বিচারপতির যে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন , আমরা আশা করব দেশের আদালত গুলোর বিচারপতিদের সম্মিৎ ফিরবে। তারা আইন অনুযায়ী সংবিধান মেনে সংবেদনশীল মননে পরিবেশ বিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবেন। যদি সম্মিৎ না ফিরে , যদি ভূমিকা হয় পরিবেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী, তাহলে সলিল চৌধুরীর ভাষায় বলতেই হবে -"বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা/ আজ জেগেছে এই জনতা,এই জনতা"/... নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে "।

দুর্গা চৌমুহনী বিপনিবিতান ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন কর্তৃক থেকে প্রকাশিত

সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন